একাত্তরের পথের ধারে

শাহরিয়ার কবির

অমর ২১শে বইমেলা

একাত্তরের পথের ধারে

শাহরিয়ার কবির

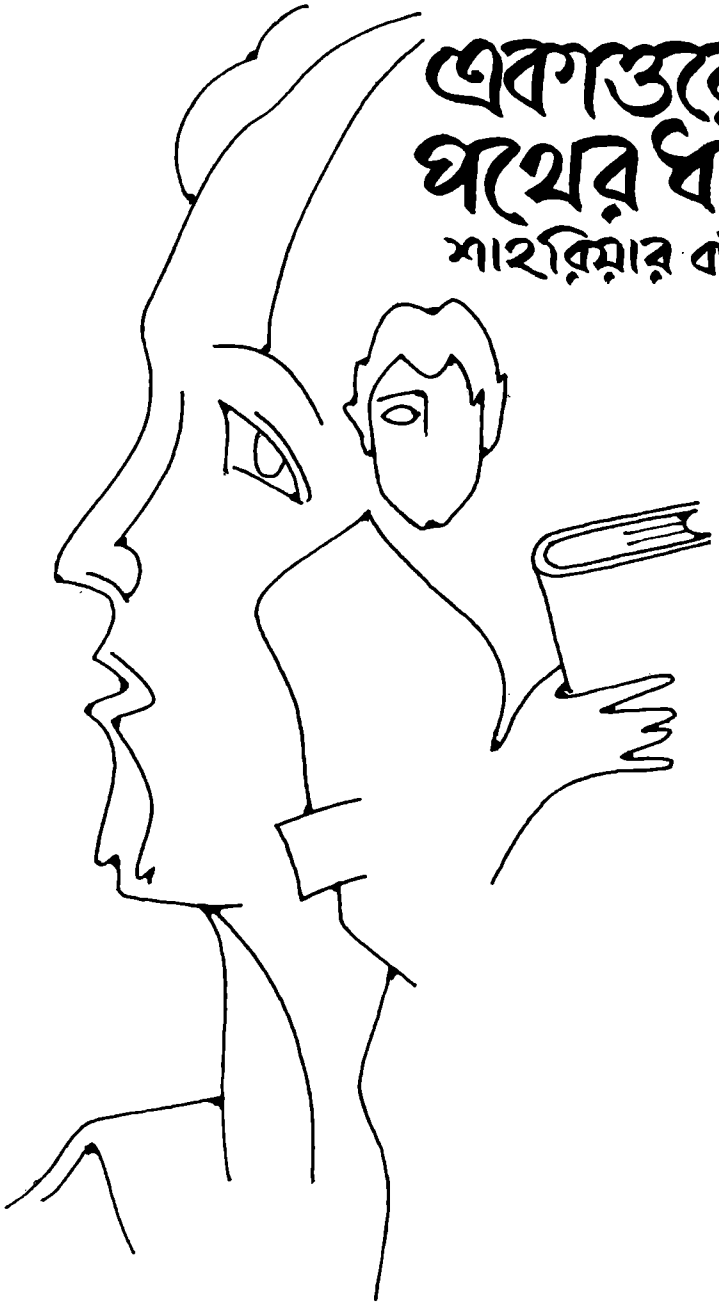

ISBN 984-458-074-9

সময়

সময় ৭৪
স্বত্ব
অর্পিতা শাহরিয়ার
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ১৯৯৭
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
কম্পোজ
নূশা কম্পিউটার্স
৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট ঢাকা
মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

উ ৎ স র্গ

পান্না কায়সারকে

লেখকের অন্যান্য বই

পুবের সূর্য
হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার
কমরেড মাও সেতুঙ
একাত্তরের যীশু
ওদের জানিয়ে দাও
জনৈক প্রতারকের কাহিনী
সীমান্তে সংঘাত
নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা
আনোয়ার হোজার স্মৃতিঃ রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে
হানাবাড়ির রহস্য
মিছিলের একজন
পাথারিয়ার খনি রহস্য
মহাবিপদ সংকেত
নিশির ডাক
বার্চবনে ঝড়
ক্রান্তিকালের মানুষ
বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার
কার্পেথিয়ানের কালো গোলাপ
রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র
বহুরূপী
অন্যরকম আটদিন
চীনা ভূতের গল্প
অনীকের জন্য ভালোবাসা
গণআদালতের পটভূমি
বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র
আলোর পাখিরা
লুসাই পাহাড়ের শয়তান
বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ
সাধু গ্রেগরির দিনগুলি

লেখকের কথা

'একাত্তরের পথের ধারে' একেবারে ছোটদের জন্য নয়, যেমনটি আমি সব সময় লিখি। পরিণত কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে এ উপন্যাস, বিশেষ করে যারা দেশ সম্পর্কে ভাবে, মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে জন্মালেও যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে চায়। ছোটদের জন্য রাজনৈতিক উপন্যাস আগেও লিখেছি, তবে এখানে রাজনীতি এসেছে আরও সরাসরি। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা কাল্পনিকই হয়, তবে একটা বিশেষ সময়ের কথা বলা হয়েছে বলে সেই সময়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব — যেমন জাহানারা ইমামের নাম উল্লেখ করতে হয়েছে কয়েকবার। এরকম আরও কিছু নাম উল্লেখ করতে হয়েছে, যাঁরা মূল কাহিনীর নেপথ্যে আছেন। কাহিনীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক। যদি কারও সঙ্গে কেউ কোনো মিল খুঁজে পান সেটা হবে কাকতালীয় ঘটনা।

শা. ক.

১৯ জানুয়ারি ১৯৯৪

জুয়েলের হার

ঘুমের ভেতর জুয়েলের মনে হলো পায়ের পাতার ওপর কী যেন কামড়াচ্ছে। ছোটবেলায় এক বদরাগী রাজহাঁস ওর গোড়ালি কামড়ে দিয়েছিলো। রক্ত বেরোয়নি, তবু ভীষণ জ্বালা করেছিলো। তারপর এত বছর কেটে গেছে; পুরোনো ঢাকার এক নম্বর মাস্তান হিসেবে সবাই এক ডাকে চেনে, লোকে দেখলে ভয় পায়, পাতি মাস্তানরা সমীহ করে দূরে সরে যায়, তবু রাজহাঁস দেখলে এখনও ভয় পায় জুয়েল। কথাটা কাউকে সে বলেনি, বলার কথাও নয়। চব্বিশ বছর বয়সী রংবাজ জুয়েল, যার এক ঘুষিতে কারাতের ব্ল্যাকবেল্ট হীরার চারটা দাঁত মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে, সে কিনা রাজহাঁস দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে হাঁটে — এ কথা কেউ শুনলে ওর মান-ইজ্জত কিছুই থাকবে না।

কামড়টা রাজহাঁসের — কথাটা মনে হতেই এক লাফে বিছানার ওপর উঠে বসলো জুয়েল। চোখ কচলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো কোথাও রাজহাঁস দূরে থাক, চড়ুই পাখিরও দেখা নেই। জানালার ভারি পর্দার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ছুরির ফলার মতো ওর পায়ের পাতায় পড়েছিলো। চৈত্রের রোদ এমনিতেই যা তেজী, অনেকক্ষণ এক জায়গায় পড়াতে মনে হচ্ছিলো কিছু বুঝি কামড় বসিয়েছে সেখানে। পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে রোদের ধারালো তাপ অনুভব করলো সে।

এত বেলা পর্যন্ত জুয়েল কখনও ঘুমায় না। যত রাতেই শুতে যাক, ভোর ছটার ভেতর ওর ঘুম ভাঙে। দেয়াল ঘড়িতে জুয়েল তাকিয়ে দেখলো বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। হাই তুলে ভাবলো, ঘুমের দোষ কি! পাড়ার মসজিদে যখন ফজরের আজান হয় তখনও ও জেগেছিলো। সরকারী দলের এক পাতি নেতার সঙ্গে কাল রাতে ওর ভীষণ একচোট হয়ে গেছে।

ওকে ভাড়া করা হয়েছিলো একটা জনসভা ভাঙার জন্য। কি এক নির্মূল কমিটি

নাকি করেছে কোন এক শহীদের মা। তিন দিন আগে ওকে ডেকে যখন বলা হলো — জায়গামতো আট দশটা জর্দার কৌটো মারতে পারলেই কেল্লা ফতে — ও আপত্তি করেনি। ওদের পার্টির সূত্রাপুর থানার প্রেসিডেন্ট বুড়া চিকা আবদুল বারেক আগেও ওকে বিরোধী দলের সভা ভাঙার জন্য ভাড়া করেছিলো। সেদিন বারেকের বৈঠকখানায় দাড়িওয়ালা, মাথায় টুপি আর প্যান্ট-শার্ট পরা দু'জন লোক ছিলো। একজনের বয়স তিরিশের মতো। মুখে কালো চাপদাড়ি, আরেকজন চল্লিশের ওপরে, কাঁচা-পাকা দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। কম বয়সী চাপদাড়িওয়ালা ওকে বললো, 'মালপত্রের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না জনাব। ইণ্ডিয়া থেকে মাশআল্লাহ কদিন আগে আমাদের একটা ভালো চালান এসেছে।'

জুয়েল তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে জবাব দিয়েছিলো, দশ-বারেটা জর্দার ডিব্বার জন্য ও চিন্তা করে না। চিকা বারেক কাঁচাপাকা দাড়িকে প্রশ্ন করলো, 'আপনেরা কী আন্দাজ করতাছেন? ওই বুড়ি বেটির মিটিঙে কত পাবলিক ওইবো?'

একটু ভেবে কাঁচাপাকা দাড়ি বললো, 'সাত-আট হাজার হতে পারে, বেশিও হতে পারে।'

থুতনির সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বারেক অবাক হয়ে বললো, 'কন কি ফোরকান বাই? এত পাবলিক তো আপনেগো মিটিঙেও অয় না! আট-দশ হাজার মানুষ আনতে দুই তিনি লাখ টাকা লাগবো না? কদিন ওইছে ওই নির্মূল কমিটি করছে? এত টাকা অরা পাইবো কই?'

চাপদাড়ি বললো, 'ওরা ইণ্ডিয়া থেকে টাকা পায়। ওদের পেছনে আওয়ামী লীগ আছে, পাঁচ দলওয়ালারা আছে, কমিউনিস্টরা আছে। ছাব্বিশে মার্চে ওরা রমনার মাঠে কম লোক আনেনি।'

আবদুল বারেক কাষ্ঠ হেসে বললো, 'ছাব্বিশা মার্চ আছিলো স্বাধীনতা দিবস। হুদা বাই কইছে মিলিটারির প্যারেড দেখতে যেই পাবলিক গেছিলো, হ্যারাই গোলাম আযমের বিচারের তামশা দেখবার লাইগা জাহানারা ইমামের মিটিঙে গেছে।'

কাঁচাপাকা দাড়ি বললো, 'ছাব্বিশে মার্চ আপনারা ভুল করেছেন ওদের বাধা না দিয়ে। এবার আমরা আর ভুল করতে চাই না। মোবিন ভাইর সঙ্গে আমাদের লিডাররা কথা বলেছেন।'

আবদুল বারেক একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'হ, মোবিন বাই কইছে দেইখা আমগো পোলাপান যাইবো। তয় কতা ওইলো গিয়া, হ্যারা লাগছে আপনেগো পিছে, আপনেরা গরে বইয়া থাইকা আমাগো ঝামেলার ভিতরে ফালাইবেন, এইটা ইনসাফের কথা না।'

কাঁচাপাকা দাড়ি বাঁকা ঠোটে হেসে বললো, 'বেশক! আজ আমাদের পেছনে লেগেছে, কাল আপনাদের পেছনে লাগবে। আমাদের ছেলেরা ঘরে বসে আছে কী বললো! ওরা ওদের কাজ ঠিকই করবে। মিটিংটা আপনাদের এলাকায় হচ্ছে। মোবিন ভাই বলেছেন পুরোনো ঢাকার দশটা ওয়ার্ডকে বিশেষভাবে তৈরি থাকতে।'

জুয়েল এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলো। বারেকের সঙ্গে দাড়িওয়ালাদের কথা শুনে ওর মনে হলো, মিটিঙে লোক কম হবে না। বারেককে ও বললো, 'আপনেরা

যদি মনে করেন মিটিঙে আট-দশ হাজার লোক ওইবো, মাল-মশলা আরও বেশি লাগবো।'

চাপদাড়ি ওকে বললো, 'জুয়েল সাহেব, একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো দরকার। স্টেজ ভাঙার দায়িত্ব আমাদের। আপনারা পাবলিকের ভেতর কাজ করবেন। স্টেজে বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক যাতে সরে যায় তার জন্য দশ-বারোটাই যথেষ্ট।'

জুয়েল কথা না বাড়িয়ে আবদুল বারেকের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে চলে এসেছে। নাজিরা বাজারের ফাইভ স্টার জিমনাসিয়ামে ওর চ্যালা আছে জনা দশেক। অর্ধেক টাকা ওদের দিতে হয়েছে। কাজ কি হবে সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছে। আট-দশ হাজার লোকের মিটিঙ ভাঙা ওর জন্য কঠিন কোনো কাজ নয়। ঘরে ফিরে দু'দিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।

গতকাল মিটিঙ শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই জুয়েল আর তার দল জায়গামতো পজিশন নিয়ে বসেছিলো। দু'জন গুলিস্তান বিল্ডিং-এর ছাদে, দু'জন আউটার স্টেডিয়ামের দেয়ালের ভেতর, দু'জন স্টেডিয়ামের পশ্চিম গেট-এ, দু'জন জিপিও'র ছাদে, আর দু'জন জুয়েলের পাশে পূর্ণিমা স্ন্যাকস-এর সামনে — এই ছিলো ব্যবস্থা। প্রত্যেকের পকেটে দুটো করে জর্দার কৌটো। জুয়েলের পকেটে শুধু ক্ষুদে পিস্তল। পুলিশ ওদের সবাইকে চেনে, ঝামেলার কিছুই ছিলো না। আওয়ামী লীগের একজন মাস্তান জুয়েলের বন্ধু। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো মিটিঙে যাবে কি না। ও পাল্টা প্রশ্ন করেছে, এটা কি আওয়ামী লীগের মিটিঙ? — ও কেন যাবে? এতে জুয়েল আরও নিশ্চিন্ত ছিলো, কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো পাবলিক।

মিটিঙ শুরু হওয়ার কথা চারটায়। জুয়েল জানে, এসব মিটিঙ কখনও সময়মতো শুরু হয় না। লোক জমতে জমতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজবে। পাঁচটার দিকে হামলা করলেই চলবে। ওদের এ্যাকশনের পর পুলিশ নামবে রাস্তায়। তারপর আর দেখতে হবে না। বেপরোয়া লাঠিচার্জ, ধাওয়া, টিয়ারগ্যাস — সব কিছু মিলিয়ে মিটিঙওয়ালাদের বারোটা বাজবে। সাড়ে তিনটার দিকে পূর্ণিমা স্ন্যাকস-এ দুই সঙ্গী নিয়ে ঠাণ্ডা কোক খেতে খেতে জুয়েল মনে মনে হাসছিলো। কোন বেচারা শহীদের মা বেঘোরে মরতে এসেছে! কি দরকার ছিলো গোলাম আযমকে নিয়ে এসব হাউকাউ করার!

জুয়েলদের হিসেব গড়বড় করে দিলো সাধারণ মানুষ। চারটা থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগলো মিছিল করে। সাড়ে চারটার ভেতর মানুষের জোয়ার গুলিস্তানের মোড় ছাড়িয়ে গেলো। পৌনে পাঁচটার দিকে মিটিঙ শুরু হওয়ার পর জুয়েল পূর্ণিমা বিল্ডিং-এর ছাদে উঠলো লোকের পরিমাণ আন্দাজ করার জন্য। মিটিঙের মানুষ ততক্ষণে গুলিস্তান ভবনের দক্ষিণ মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। নবাবপুর রোড দিয়ে তখনও খণ্ড খণ্ড মিছিল আসছিলো নানা রঙের ব্যানার নিয়ে। জুয়েলের মনে হলো, মিটিঙে লোকের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পেরিয়ে যাবে। নিজেকে কিছুটা অসহায় মনে হলো। এত লোকের ভেতর ঠিকমতো কাজ শেষ করে বেরিয়ে যেতে পারবে তো!

নিচে নেমে উদ্বিগ্ন জুয়েল অপেক্ষা করতে লাগলো জামাতের ছেলেরা কখন স্টেজে হামলা চালায়। মিটিঙের বক্তারা ততক্ষণে সভা জমিয়ে ফেলেছে। ঘন ঘন তালি হচ্ছে। থেকে থেকে শ্লোগান হচ্ছে। বক্তাদের মাঝখানে জাহানারা ইমাম দাঁড়িয়ে সবাইকে বসতে বললেন। জুয়েলের চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলো সবাই টপাটপ বসে পড়লো। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে নিজেকে বড় একা মনে হলো ওর। পেছন থেকে ওকে উদ্দেশ্য করে কে যেন ধমকের গলায় বললো, 'এই যে ভাই নীল শার্ট, বসেন না!'

জুয়েল ফুটপাতে উঠে একেবারে দোকানের দেয়াল পর্যন্ত সরে এলো। মনে মনে ভাবছিলো স্টেজ-এ হামলা না হলে ও বেঁচে যায়। এরকম হবে জানলে কলতাবাজার আর মিটফোর্ডের গ্রুপকে বলতো। আবদুল বারেকের সঙ্গেও এক লাখের নিচে রফা করতো না। হঠাৎ বারেক আর ওর দুই দাড়িওয়ালা সঙ্গীর ওপর ভীষণ রাগ হলো জুয়েলের। এত বড় মিটিঙ ভাঙার জন্য মোটে পঁচিশ হাজার টাকা! ইয়ার্কি মারার একটা সীমা থাকা উচিৎ। ওর যা প্রস্তুতি — একটা কিছু ঘটলে জান নিয়ে টানাটানি পড়বে।

শেষ পর্যন্ত মঞ্চে জামাতীরা হামলা না করাতে মনে মনে খুশি হলো জুয়েল। মাগরেবের আজানের সময় বক্তৃতা দেয়া বন্ধ হলে ও হাঁটতে হাঁটতে মিটিঙের শেষ মাথায় চলে এলো। নামাজের জন্য অনেক লোক চলে গেছে। ফুলবাড়িয়া বাস স্টেশনের কাছে ট্রাফিক পুলিশের দাঁড়াবার উঁচু জায়গাটায় গিয়ে ও বসলো। এক পাশে চোদ্দ-পনেরো বছরের হালকা গড়নের শ্যামলা চেহারার একটা ছেলে বসেছিলো। রোদের আঁচে ওর চেহারা কালো হয়ে গেছে। মায়াভরা চোখে তাকিয়েছিলো বহু দূরের মঞ্চের দিকে। জুয়েল ভেবে পেলো না এইটুকু ছেলে একা কেন এই মিটিঙে এসেছে।

সামনে তাকিয়ে কম বয়সী আরও অনেক ছেলে ওর চোখে পড়লো। মনে হলো ছাত্র সংগঠনের কর্মী। একটা বাদামওয়ালা ডেকে ও দুইশ গ্রাম বাদাম কিনলো। পাশের ছেলেটা আড়চোখে ওকে দেখছিলো। জুয়েলের চেহারা এবং স্বাস্থ্য দুটোই চোখে পড়ার মতো। গায়ের রঙ তামাটে, খাড়া নাক, ধারালো চোখ, চাপা ঠোঁট, সব মিলিয়ে ওর চেহারার এক ধরনের রুক্ষ আকর্ষণ রয়েছে। পুরো-হাতা জামা গায়ে দিলেও ওর হাত আর বুকের মাসলের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

নামাজের জন্য সভার কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। জুয়েল দুটো বাদাম মুখে দিয়ে হঠাৎ কি মনে হতে এক মুঠো তুলে নিয়ে পাশের ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিলো — 'নাও, বাদাম খাও।'

ছেলেটা লজ্জা পেলো। আড়ষ্ট গলায় বললো, 'না, থাক।'

ছেলেটার চেহারা দেখে জুয়েল বুঝেছিলো বহুক্ষণ ওর পেটে কিছু পড়েনি। আবার বললো, 'খাও না। লজ্জা কি।' এই বলে ওর হাতের মুঠোয় বাদাম গুঁজে দিলো।

ছেলেটার ঠোঁটের ফাঁকে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠলো। জুয়েল বাদাম খেতে খেতে বললো, 'কোন পার্টি করো?'

ছেলেটা আস্তে আস্তে বললো, 'আমি কোনো পার্টি করি না।'

'তবে?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো জুয়েল।

'তবে কী?' ছেলেটা জুয়েলকে চোখ তুলে দেখলো। জুয়েল বলতে চেয়েছিলো, তবে কেন ও মিটিঙে এসেছে — কিন্তু বললো না। ছেলেটা নিশ্চয় অনুমান করছে ও মিটিঙ শুনতে এসেছে। 'তোমার নাম কি?' প্রসঙ্গ পাল্টাতে গিয়ে মৃদু হাসলো জুয়েল।

জুয়েলের চেহারার সঙ্গে হাসিটা খুবই বেমানান। কিশোরের মতো নিষ্পাপ ওর হাসি। ওর হাসি দেখে কেউ ভাবতে পারবে না এই বয়সে ও বারো জন মানুষকে খুন করেছে।

'আমার নাম তপু। নির্মূল কমিটির কর্মী।' মৃদু হেসে জবাব দিলো ছেলেটা।

'কোন ক্লাসে পড়ো?'

'ক্লাশ টেন-এ।'

জুয়েল আই এস সি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। ক্লাস ট্রাস করেনি। জানতে চাইলো, 'বাসা কোথায়?'

'গেণ্ডারিয়া, ঢালকা নগর।'

জুয়েল থাকে কাছেই ফরিদাবাদে। বললো, 'এদ্দূর আসছো মিটিঙ শুনতে?'

মৃদু হেসে তপু বললো, 'গেণ্ডারিয়া থেকে অনেকে এসেছে। জাহানারা ইমামের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে।'

'কেন ভালো লাগে?' জাহানারা ইমামের নাম আবদুল বারেকদের কাছেই শুনেছে জুয়েল । ওরা যে ভাবে বলে তাতে করে ভালো লাগার মতো কিছু খুঁজে পায়নি ও।

তপু বললো, 'আমি ওঁর একাত্তরের দিনগুলো পড়ে কেঁদেছি। ওঁর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমার বাবাও মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন।'

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটা তপু যে রকম অহংকারের সঙ্গে উচ্চারণ করলো, শুনে কিছুটা অবাক হলো জুয়েল। যুদ্ধের কথা ওর কিছুই মনে নেই। তখন মোটে দু' বছর বয়স ছিলো ওর। বাড়িতে ওর জন্মের কথা উঠলে বাবা-মা বলতো গণ্ডগোলের বছর জন্মেছে ও। বিক্রমপুরের শ্রীনগরে ওর জন্ম। বিরাট বড় বাড়ি ওদের। বাবা-মা, ছোট দুই ভাই-বোন এখনও গ্রামের বাড়িতে থাকে।

গ্রামের স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে এস এস সি পাশ করে অনেক স্বপ্ন নিয়ে শহরে এসে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলো জুয়েল। কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই ছোটনদের দলের এক ছেলের নজরে পড়ে গিয়েছিলো। সেই হল্-এ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, জিমনাসিয়ামে ভর্তি করিয়ে যত্ন করে ব্যায়াম শিখিয়েছে, ছুরি-পিস্তল-কাটা রাইফেল চালানো শিখিয়েছে, জর্দার কৌটায় মশলা পুরে হাতবোমা বানানো শিখিয়েছে, সঙ্গে নিয়ে দোকান থেকে চাঁদা তুলতে হয় কিভাবে তাও শিখিয়েছে। জগন্নাথ কলেজে তখন লোটনদের দারুন দাপট। জুয়েল টেরও পেলো না ওর কৈশোরের স্বপ্ন কখন কিভাবে হারিয়ে গেছে।

এরশাদ জেলে যাওয়ার পর ছোটনদের দুর্দিন শুরু হলো। সুযোগ বুঝে জুয়েলও বারেকদের দলে জুটে গেলো। ইলেকশনের সময় ওর কাজ দেখে বারেক খুশি হয়ে গেণ্ডারিয়ায় ওর থাকার জন্য আলাদা বাসা ঠিক করে দিয়েছে। প্রতি মাসে হাত-খরচের জন্য আট-দশ হাজার টাকা দেয়, বড় কোনো কাজে পাঠালে, বিশেষ করে খুন-খারাপির কাজে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা আয় হয়। জুয়েল একা থাকে, বাড়ি

যায় না। মাঝে মাঝে বাড়িতে টাকা পাঠায়। ওর যে জগৎ সেখানে মুক্তিযুদ্ধকে বলে 'গণ্ডগোলের বছর'। মুক্তিবাহিনী, পাকিস্তানী বাহিনী আর রাজাকারদের সম্পর্কে ওর ভাসা-ভাসা ধারণা আছে, নিজে কখনও কোনো পক্ষ নেয়ার কথা ভাবেনি। এরকম এক তরুণ জুয়েল বিরানব্বই সালের ছাব্বিশে এপ্রিলের সন্ধ্যায় অচেনা এক কিশোরের কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের অহংকার উচ্চারণে অবাক হবে — এ আর বিচিত্র কী!

মাগরেবের নামাজের পর জাহানারা ইমাম বক্তৃতা দিতে উঠলেন। জুয়েল আগে কখনও তাঁর বক্তৃতা শোনেনি। তিনি বর্ণনা দিচ্ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানী সৈন্যরা আর তাদের এদেশী দালাল, বিশেষ করে জামাতীরা, কিভাবে তিরিশ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, নারী নির্যাতন করেছে, দেশের নাম-করা লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মেরেছে, আর কিভাবে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে এক কোটি মানুষকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। তাঁর বলার সময় জুয়েলের চোখের সামনে সিনেমার দৃশ্যের মতো কতগুলো ছবি ভাসতে লাগলো।

তাঁর কথা কিছুটা জড়ানো ছিলো। জুয়েল বক্তৃতা শুনতে শুনতে এক ফাঁকে তপুকে প্রশ্ন করলো, 'ওনার কথা এরকম কেন? ওনার বয়স কি খুব বেশি?

অত দূর থেকে জুয়েল মঞ্চে জাহানারা ইমামের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো না। ওর প্রশ্ন শুনে তপু একটু বিরক্ত হলো — 'আপনি জানেন না ওঁর মুখে ক্যান্সারের অপারেশন হয়েছে?'

জুয়েল জানে না । তবে এই না-জানার কথাটা ও তপুর কাছে স্বীকার করতে চাইলো না। ওর চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট একটা ছেলে এত জানে, এটা ওর পছন্দ হচ্ছিলো না। আবার তপুর চেহারায় এমন এক সরলতা মাখানো যে ওর ওপর রাগও করা যাচ্ছিলো না।

জাহানারা ইমাম যখন ভাঙা গলায় তাঁর ছেলে রুমীর ধরা পড়ার কথা বলছিলেন তখন তপু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। জুয়েল অবাক হয়ে ওকে দেখলো। ওর দু'গালে কান্নার দাগ। থুতনিতে মাথা রেখে ও তাকিয়ে আছে দূরের মঞ্চের দিকে, পাশে যে আর কেউ রয়েছে সে খেয়াল নেই। জুয়েল ওর পিঠে হাত রেখে বললো, 'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে তপু?'

তপু একটু চমকে উঠে চোখ মুছলো। একবার জুয়েলের দিকে তাকালো। তারপর মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। বাবার সবচেয়ে আদরের ভাই ছিলেন তিনি।'

জুয়েল একটু অবাক হয়ে ভাবলো, একুশ বছর আগে চাচা যুদ্ধে মরেছে বলে এখন তার জন্য কাঁদতে হবে এ কেমন ছেলে? মেয়েদের মতো নরম মন নিয়ে এ ছেলে সংসারের ঝড়-ঝাপটা সইবে কেমন করে? জাহানারা ইমাম তখনও বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আকাশে সন্ধ্যার আলো মিলিয়ে গেলেও সোডিয়াম লাইটের সোনালি আলোয় ভাসছে বিশাল জনসভা। লোকজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বক্তৃতা শুনছে। মাইকে কিছুটা ঘড়ঘড়ে শব্দ হচ্ছিলো। কথাও খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো না। জুয়েল উঠে দাঁড়ালো।

ওর ধারণা ছিলো, বারেক সভার লোক সমাগমের কথা শুনলে উচ্চবাচ্য করবে না। হালকা মনে শিষ বাজাতে বাজাতে বারেকের ঘরে ঢুকতেই দেখে হাড়ির মতো মুখ করে বারেক আর সেদিনের দুই দাড়িওয়ালা বসে আছে। জুয়েলকে দেখে বারেক খেঁকিয়ে উঠলো — 'চাপা মারনের সময় তো খুব পার! একটাও তো ফুটাইবার পারলা না।'

'আপনের মাথা খারাপ ওইছে বারেক ভাই?' অবাক হয়ে জুয়েল বললো, 'লাখের কাছে মানুষ আইছে মিটিঙে, দশ–বারোজনের কাম নিকি এইটা?'

'কথাটা আগে বললেন না কেন জনাব?' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কাঁচাপাকা দাড়ি।

'আগে কী বলবো?' জুয়েল বিরক্ত হয়ে বললো, 'আপনারা বললেন দশ হাজারের বেশি লোক হবে না, আমি সেভাবে প্ল্যান করেছি। আপনাদের পোলাপানও তো কিছু করলো না। কথা ছিলো ওরা স্টেজ ভাঙলে পরে আমরা পাবলিকের ভেতরে ফাটাব।'

কাঁচাপাকা দাড়ি গম্ভীর হয়ে বললো, 'আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা স্টেজ ঘিরে রেখেছিলো। আমাদের ছেলেরা ধারে কাছে যেতে পারেনি। আপনারা ফাটানো শুরু করলে আমাদের ছেলেরা গণ্ডোগোলের সুযোগ নিতে পারতো।'

'কথাটা ঠিক বললেন না মিয়াভাই। আওয়ামী লীগের মালওয়ালাদের আমি চিনি। ওরা কেউ মিটিঙে যায়নি। পাবলিক দেখে আপনাদের ছেলেরা ভয় পেয়েছে।'

আবদুল বারেক ফোড়ন কেটে বললো, 'হ্যারা ডরাইছে, আর তুমি খুব বাহাদুরি দ্যাখাইয়া আইছো? যাও, বাড়িত গিয়া মার আঁচলের তলায় হুইয়া থাক।'

এরপর স্বাভাবিকভাবেই জুয়েল মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। বারেকও অনেক আজেবাজে কথা বলেছে বাইরের লোক দুটোর সামনে। একথা ওরা স্বীকার করলো না দোষ ওর নয়, দোষ ওদের হিসাবের গরমিলের।

রাত দশটায় বারেকের ওখান থেকে বেরিয়ে কালা রশিদের বাড়ি গিয়ে গলা–সমান মদ খেয়েছে জুয়েল, অনেক রাতে কালা রশিদের ছোট ভাই ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। বাড়িতে এসে বমি করেছে। মাথা কিছুটা হালকা হয়েছে ওতে। তবু ও কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না বারেক ওকে 'গাদ্দার' বলেছে।

কাল রাতের কথাটা মনে হতেই জুয়েলের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেলো। বারেককে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। ওর আজ পাঁচটা খুন করার পরও শুনতে হয়েছে ও গাদ্দার! জুয়েল ঠিক করলো, এ নিয়ে আগে দলের হাই কমাণ্ডের সঙ্গে কথা বলবে। বারেক জানে না ইলেকশনের পর মোবিন ভাই ডেকে নিয়ে ওর সঙ্গে দু'বার কথা বলেছেন।

বিছানা থেকে নেমে রোজকার মতো ঝাড়া এক ঘণ্টা ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করলো জুয়েল। মনটা অনেক হালকা হলো এতে। ততক্ষণে সারা শরীর বেয়ে নদীর স্রোতের মতো ঘামের ধারা নেমেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে নিজেকে দেখলো সে। বারেকের কথা ভুলে গেলো। রাগও পড়ে গেলা। নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হলো। ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের মাপ, কোমর বত্রিশ ইঞ্চি। শরীরের কোথাও একরত্তি চর্বি নেই, ঘুমন্ত সাপের মতো মাসলগুলো মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে, মনে হয় রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা কোনো দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা। বারেকের পাটকাঠির মতো শরীরটার কথা মনে

হতেই হাসি পেলো জুয়েলের। সরু গলাটা বাঁ হাতে আলতো করে ধরলেও মট করে ভেঙে যাবে। দেখা যাবে ওর কোন জামাতী আব্বা আসে ওকে বাঁচাতে!

সকালের নাশতা ও ফরিদাবাদ হোটেলে নয়তো লোহার পুলের জসিমের হোটেলে সারে। মাঝে মাঝে দুপুরেও সেখানে খায়। আজ একসঙ্গে দুটো হবে। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একসঙ্গে খেলে নাকি ওটাকে ব্রাঞ্চ বলে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এক লাজুক কবি, ওকে কথাটা শিখিয়েছে। পেশাদার মাস্তান হওয়ার কারণে বিচিত্র সব লোকজনের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। একবার হলের সিট দখলের জন্য মারপিট করেছিলো। তখন এই লাজুক কবির সঙ্গে পরিচয় হয়। ওকে দেবতার মতো ভক্তি করে কবি। জুয়েলকে নিয়ে নাকি কবিতাও লিখেছে সে।

নিজের শক্তি, সাহস, সৌন্দর্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন জুয়েল। ও যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, যারা চেনে না তারা মুগ্ধ চোখে তাকায়, যারা চেনে তারা দূরে সরে যায়। বেসুরো গলায় 'তুঝে মিলনে কো দিল' গাইতে গাইতে ও বাথরুমে ঢুকলো। পনেরো মিনিট শাওয়ার নিয়ে ঝরঝরে হয়ে নীল জিনস্-এর প্যান্টের সঙ্গে হলুদ গেঞ্জি পরে প্রচুর কোলন মেখে ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে ও যখন রাজার মতো রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন দুপুর দেড়টা। মাথার ওপর চৈত্রের আগুনঝরা রোদ। এতে জুয়েলের কিছু হয় না। ও ঠিক করলো, আগে মধুর ক্যান্টিনেই যাবে। ওখান থেকে লাজুক কবিকে নিয়ে কোনো চাইনিজ-এ যাবে। নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে! শুধু প্রশংসা শোনা নয়, কবিকে ও বলবে মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু বই জোগাড় করে দিতে। কাল সন্ধ্যায় তপু ওকে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিলো তখনই ওর মনে হচ্ছিলো এইটুকুন এক ছেলের জানার কাছে ও হেরে যাচ্ছে। চব্বিশ বছরের জীবনে জুয়েল হারতে শেখেনি।

স্বপ্নের হাতছানি

সকালে চা খেতে খেতে খবরের কাগজগুলোয় জাহানারা ইমামের মিটিঙের বড় বড় ছবি দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আবদুল বারেকের। জুয়েলের ওপর ওর এত ভরসা ছিলো অথচ কিছুই করা গেলো না। জামাতের ছেলেরা ওদের কাজ করেনি বলে নিজের ছেলেরাও বেইমানি করবে — এটা সহ্য করা কঠিন। নাশতা করেই হাই কমাণ্ডের তিন নম্বর নেতা মোবিনউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে গেলো বারেক।

হাই কমাণ্ডের প্রথম সাত জন নেতার আলাদা. বাহিনী আছে। বারেক হলো মোবিনউদ্দিনের বাহিনীর প্রধান। দেখতে রোগা-পাতলা হলেও শয়তানি বুদ্ধিতে ওর জুড়ি মেলা ভার। জুয়েলদের মতো মাস্তানদের গত বারো বছর ধরে ও চরিয়ে বেড়াচ্ছে। গত রাতে জুয়েল ওর সঙ্গে যে বেয়াদবি করেছে এর বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা না নিলে দলের ভেতর নিজের পজিশন ঠিক থাকবে না। পুরোনো ঢাকায় জুয়েল ওর কথায় ওঠে বসে — এ রকম একটা প্রচারের কারণে শুধু নিজের দলে নয়, বাইরেও সবাই ওকে সমীহ করে কথা বলে। গত রাতে জামাতের সিটি কমিটির দুই নেতা সব দেখেছে। ওরা নিশ্চয় বারেকের বিড়ম্বনার কথা দলের ভেতর আলোচনা করবে। নিজের দলেও কথাটা গোপন থাকবে না। মোবিনউদ্দিনকে বলে জুয়েলের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে।

বিনা ডাকে আসার কারণে বারেককে মন্ত্রী মোবিনউদ্দিনের বাইরের বসার ঘরে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। ওর পরে এসে অনেকে নেতার সঙ্গে যেভাবে দেখা করছে বিষয়টা ওর খুব মনঃপুত হচ্ছিলো না। তবু গরজ ওরই। চুপচাপ বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে মেজাজ ওর আরও খারাপ হলো। সাংবাদিকরা সবাই আওয়ামী লীগের দালাল হয়ে গেছে। নির্মূলওয়ালাদের মিটিঙের খবর দিয়ে সবাই পাতা বোঝাই করে ফেলেছে।

ভিড় কমার পর বারেকের ডাক পড়লো ভেতরে। ওকে দেখে মোবিনউদ্দিন অন্যদিন যে রকম খুশি হতেন সে রকম কিছুই হলো না। বয়সে বারেকের ছ-সাত বছরের ছোট হবেন। এরই ভেতর ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কি খবর বারেক সাহেব? লিডারের কাছে মুখ দেখাবার যে কোনো পথ রাখলেন না।'

বারেক ওকে জুয়েলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আদ্যপান্ত খুলে বললো। শুধু জামাতীদের মঞ্চ হামলার পরিকল্পনার বিষয়টা চেপে গেলো। সব শেষে বললো জুয়েলকে ওর বেআদবির জন্য বারেকের কাছে মাপ চাইতে হবে, আর সেই সঙ্গে কথা দিতে হবে এ ধরনের বেআদবি ভবিষ্যতে করবে না।

বারেকের কথা শুনে মোবিনউদ্দিন খুবই বিরক্ত হলে। জুয়েলের হাতে পুরোনো ঢাকার তিনটা নাম করা টেরর গ্রুপ। ওকে চটাতে গেলে কখন কী হয় বলা কঠিন। গম্ভীর গলায় বারেককে বললেন, 'জুয়েলকে আমি যতখানি জানি, ও আপনার কাছে মাপ চাইবে না।'

'চাইবো না ক্যান? আপনের সামনে আইয়া কউক, কাইল ফোরকানগো মোকাবিলায় আমার লগে বেত্তমিজি করে নাই?'

ঠাণ্ডা গলায় মোবিনউদ্দিন বললেন, 'বারেক সাহেব, আমি চাই আপনি ওর সঙ্গে কোনো গণ্ডগোল করবেন না। জুয়েল আমাদের পার্টির একটা এ্যাসেট। ওকে চটাতে গেলে ক্ষতি আমাদেরই।'

বারেক দুঃখ পাওয়া গলায় বললো, 'আপনে আমারে কী করবার কন?'

'জুয়েলের সঙ্গে গণ্ডগোল মিটিয়ে ফেলুন। নির্মূলওয়ালারা যেভাবে সারা দেশে জাল ফেলেছে তাতে অনেক রুই কাতলাই ধরা পড়তে পারে। নিজেদের লোকজন এ সময় চটানো ঠিক হবে না, বিশেষ করে যাদের ছাড়া আমাদের এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই।'

'আপনে যেমন কইবেন তেমনই করুম। তয় স্যার, কতা ওইলো, এই সব জানাজানি ওইলে দলের ভিতরে কুন ডিসিপ্লিন থাকবো না। ব্যাকতে ফ্রি ইস্টাইল কাম শুরু করবো।'

'আমি জুয়েলের সঙ্গে কথা বলবো। জানাজানি যাতে না হয় সেটা আমি দেখবো। এই বলে মোবিনউদ্দিন সামনে রাখা ফাইল খুলে ওতে মনোযোগ দিলেন। বারেক ইঙ্গিত বুঝে — 'তয় আমি যাই, সেলামালেকুম।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মোবিনউদ্দিন পিএ-কে বললেন জুয়েলকে খবর পাঠাতে, যেন আজই দেখা করে। বারেকের ওপর তিনি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। জামাতের হাই কমান্ড থেকে একটু আগে ওঁকে বলা হয়েছে — 'আপনারা যদি নির্মূল কমিটিওয়ালাদের শায়েস্তা করতে না পারেন, আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। কি করে এসব দেশদ্রোহীরা মিটিঙ-মিছিল করে আমরা দেখে নেবো।'

মোবিনউদ্দীন জামাতের নেতাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'যা করার আমরা করবো। এ সময়ে আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে বলবো। এসব বুদ্ধিজীবীদের দৌড় আমাদের জানা আছে।'

জামাত নেতা বলেছেন, 'এটা শুধু বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপার নয়। আওয়ামী লীগ ওদের পেছনে আছে। কমিউনিস্টরাও আছে। আমাদের কাগজে গত মাসে রিপোর্ট দেখেননি, ইণ্ডিয়া থেকে কিভাবে ওদের টাকা দিচ্ছে?'

'আপনারা তো শুধু অভিযোগ করেছেন। প্রমাণ দিন, সব কটাকে জেলে ঢুকিয়ে দিই।'

'তাজ্জবের কথা বললেন জনাব! আপনাদের এনএসআই, ডিএফআই যখন গোপনে কাউকে টাকা দেয়, তখন কি রশিদ নেয়? প্রমাণ থাকে কোনো? এসব ওদের কাজ থেকে আন্দাজ করতে হয়।'

জামাত নেতা এরপর আরও অনেক অপ্রিয় কথা বলেছেন মোবিনউদ্দিনকে। মনে করিয়ে দিয়েছেন তাদের টাকা ছাড়া নির্বাচনে তিনি জিততে পারতেন না। তাদের সমর্থন ছাড়া সরকার চালাতে পারবেন না। এসব কথা শুনতে মোবিনউদ্দিনের ভালো না লাগলেও চুপচাপ হজম করতে হয়েছে। ঠিক করলেন বারেকের উপর নির্ভর না করে এ্যাকশান স্কোয়াডের লিডারদের সঙ্গে নিজে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন।

মোবিনউদ্দিনের বাড়ি থেকে বারেক সোজা গেণ্ডারিয়া গেলো জুয়েলের খোঁজে। বাসায় ওকে না পেয়ে কাঠের পুলের কালা রশিদের বাসায় গেলো। জুয়েল যে তিনটা গ্রুপ চালায় তার একটার লিডার রশিদ, ওর ডান হাত। বারেককে দুপুর দুটায় শুকনো মুখে দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখে বুঝে গেলো জুয়েলের জন্য বেচারার এই দশা। ভেতরে বসার ঘরে নিয়ে সোফায় বসিয়ে বললো, 'কি ওইছে বারেক বাই! বহুৎ পেরেশান মালুম ওইতাছে?'

বারেক শুকনো গলায় বললো, 'আগে ফান্টাউন্টা নয় ঠাণ্ডা পানি দিবার কও। তোমাগো যন্তনায় শান্তিতে থাকন আমার কপালে নাই। জুয়েল কই গ্যাছে জান?'

বারেককে ফ্রিজ থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা পেপসি এনে দিয়ে রশিদ বললো, 'জুয়েল ওস্তাদ কাইল রাতে আইছিলো। হেভি মাল টানছে। মনে অয় আপনের লগে কিছু ওইছে?'

'কি ওইছে?' চোখ পিট পিট করে জানতে চাইলো বারেক।

'মাল খায়া জুয়েল বাই উল্টাসিদা কতা কইবার লাগছিলো। আপনেরে বহুৎ খারাপ খারাপ গাইল দিছে।'

বারেকের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেলো। বললো, 'অখন অরে কই পাওন যাইবো জান না?'

'না বারেক বাই।' মাথা নাড়লো রশিদ।

'রাইতে অরে খবর দিবা। অর লগে আমার বহুৎ জরুরী কতা আছে।' এই বলে বারেক নিজের বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

মধুর ক্যান্টিনের কোণের টেবিলে লাজুক কবি কায়কোবাদকে পেয়ে জুয়েলের মনটা ভালো হয়ে গেলো। স্কুটারে আসার সময় বারেকের কথা ভাবতে গিয়ে বিরক্তিতে মাথা ধরে গিয়েছিলো।

কালো প্যান্টের ওপর কলারওয়ালা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা আঁটা কায়কোবাদ জুয়েলকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, — 'কি আশ্চর্য, জুয়েল কোত্থেকে এলে? আমি ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

জুয়েল চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসে বললো, 'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

'না, কেন?'

'ওঠ, তোমাকে চাইনিজ খাওয়াবো।'

দুপুরে কায়কোবাদ দু'খানা ডালপুরি আর এক কাপ চা দিয়ে খিদে মেটায়, যদি না কোনো মক্কেল জোটে। জুয়েলকে ওর মনে হলো স্বর্গের দেবদূত।

কবির পছন্দমতো খাবারের কথা বলে ঠাণ্ডা কোকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জুয়েল বললো, 'দিন রাত খালি কবিতা লেখো, না অন্য বইটইও পড়ো?'

'পড়বো না কেন?' জুয়েল পড়ার খোঁজ করছে দেখে অবাক হলো কবি কায়কোবাদ আমিন।

'কি ধরনের বই পড়ো?'

'কবিতাই বেশি পড়ি। কাল রবার্ট গ্রেভস-এর একটা কবিতা পড়তে গিয়ে তোমার কথা মনে হলো। শুনবে?'

'এখন থাক। মুক্তিযুদ্ধের ওপর কোনো বই পড়েছো?'

'রাজনীতি আমার ভালো লাগে না। যুদ্ধের ওপর শামসুর রাহমানের একটা সুন্দর কবিতা আছে। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা। শুনবে?'

'কবিতা শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের বই খোঁজ করছো কেন?'

'কাল একটা ছোট ছেলে আমাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছে, যার আমি কিছুই জানি না।'

'তার জন্য এখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে বসবে নাকি?'

'পড়লে ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি নেই, তবে একেকটা বই একেকভাবে লেখা। আওয়ামী লীগ বলে বঙ্গবন্ধু না হলে দেশ স্বাধীন হতো না, বিএনপি বলে জিয়া না থাকলে দেশ স্বাধীন হতো না। জামাতীরা বলে গোলাম আযমও নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলে, তবে সেটা অন্যভাবে।'

'তুমি জাহানারা ইমামকে চেনো?'

'চিনবো না কেন? রোজইও তো খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখি। গোলাম আযমের বিচারের জন্য গণআদালত বসিয়েছিলেন।'

'তাঁর সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

কায়কোবাদ একটু ভেবে বললো, 'দেখো জুয়েল, রাজনীতির ব্যাপারটা আমার কাছে খুব নোংরা লাগে, তবু তাঁর কথা যদি বলো, মুক্তিযুদ্ধে তিনি তাঁর ছেলে হারিয়েছেন, স্বামী হারিয়েছেন। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিচার তিনি চাইতেই পারেন। তবে তাঁর সঙ্গে লোকজন যারা জুটেছে তাদের অনেকের ব্যাপারেই আমার

প্রশ্ন আছে।'

'আমাকে বিএনপি-র এক নেতা বলেছেন, তাঁকে দিয়ে ইণ্ডিয়া নাকি এসব করাচ্ছে আওয়ামী লীগকে গদিতে বসানোর জন্য। তারা নাকি ইণ্ডিয়া থেকে টাকা পাচ্ছে দেশে একটা গণ্ডগোল বাঁধাবার জন্য?'

'বিএনপি-র হাতে যদি প্রমাণ থাকে তারা সেটা গোপন রেখেছে কেন? তাঁকে জেলে ঢোকাচ্ছে না কেন?'

কথাটা জুয়েলেরও মনে হয়েছে। জাহানারা ইমামের মিটিঙ-মিছিল ভাঙার চাইতে তাঁকে ধরে জেলে পুরে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়। রাজনীতি নিয়ে জুয়েলও মাথা ঘামায় না। তবে মিটিঙ ভাঙার চাইতে অন্য দলের মাস্তান ঠ্যাঙানোর কাজটা তার বেশি ভালো লাগে। লড়াইটা সেখানে হয় সমানে সমানে। মিটিঙ ভাঙতে গিয়ে আগেও লক্ষ্য করেছে বোমাবাজিতে অনেক নিরীহ মানুষ জখম হয়, মারাও যায় — এটা জুয়েল পছন্দ করে না। তবে টাকার জন্য অনেক অপছন্দের কাজই ওকে করতে হয়েছে। নামাজ না পড়লেও আল্লাহ রসুল মানে, মনে কেয়ামত আর রোজ হাশরের ভয় আছে। অনেক সময় ভেবেছে আর মাস্তানি করবে না, এসব গুনাহ্‌র কাজের জন্য ওকে নিশ্চয় একদিন জবাবদিহি করতে হবে। আবার এও মনে হয়েছে, ওর চেয়ে তাদের বেশি শাস্তি হওয়া উচিৎ যারা ওকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। অবশ্য মাস্তান শায়েস্তা করাটা জুয়েল সওয়াবের কাজ মনে করে।

কায়কোবাদ বললো, 'আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে জুয়েল।'

'কি রকম?'

'মেয়েদের নিয়ে আলোচনা না করে তুমি পড়তে চাইছো, রাজনীতি বুঝতে চাইছো।'

'চাই। কারণ আমি হারতে চাই না।'

জাহানারা ইমামের একটা বই আছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর — 'একাত্তরের দিনগুলি' — পড়বে?'

'আছে তোমার কাছে?'

'আমার রুমমেটের কাছে আছে। তোমাকে কদিনের জন্য দিতে পারি।'

গত সন্ধ্যায় জুয়েল বইটার কথা তপুর মুখে শুনেছে। বললো, 'কালই এনো।'

চীনা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কায়কোবাদকে নিয়ে জুয়েল সারা বিকেল নিউমার্কেটের গেটে মেয়েদের দেখে আর আড্ডা দিয়ে কাটালো। ওদের জানাশোনা আরও ক'জন জুটে গিয়েছিলো আড্ডায়। ফেরিওয়ালা ডেকে সবাইকে চা আর প্যাটিস খাইয়ে সন্ধ্যার দিকে ঠিক করলো বলাকায় ছবি দেখবে। বাগড়া দিলো মোবিনউদ্দিনের পিএস শরাফত আলী।

জুয়েলের সঙ্গে শরাফত আলীর সম্পর্ক খুবই শীতল। প্রথমবার মোবিনউদ্দিন যখন ওকে ডেকেছিলেন দেখা করার জন্য, শরাফত আলী একটু আমলাগিরি দেখাতে চেয়েছিলেন। মোবিনউদ্দিন শুধু সরকারী দলের নেতাই নয়, জাঁদরেল মন্ত্রীও বটে। তাঁর

পিএস দাপট দেখাবেই। সেবার সচিবালয়ের গেট-এ পাহারাদারের হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে সোজা শরাফত আলীর রুমে এসে বললো, 'মোবিন ভাইর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ওকে বসতে না বলে ভুরু কুঁচকে বিরক্ত গলায় শরাফত আলী বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'

কথার ধরন দেখে জুয়েলও রেগে গেলো। গম্ভীর গলায় বললো, 'কান্দুপট্টি থেকে।'

'মানে?'

'মানে আবার কি! স্কুটারে করে কান্দুপট্টি থেকে সোজা এখানে এলাম।'

'আপনি কি এখানে ইয়ার্কি মারতে এসেছেন?'

জুয়েল চেয়ারে বসে শান্ত গলায় বললো, 'আপনি কি আমার দুলাভাই যে ইয়ার্কি মারবো? মিনিস্টার সাহেবকে বলেন জুয়েল এসেছে।'

নাম শুনে শরাফত আলী দমে গেলেন। মোবিনউদ্দিন অফিসে এসেই বলেছেন, 'জুয়েল নামে একটা ছেলে আসবে। ওর সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট কথা আছে।'

শরাফত আলী টেলিফোন তুলে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর হাত তুলে সাপের মতো ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'যান। ওই দরজা।'

সেই থেকে শরাফত আলী ওকে দু' চোখে দেখতে পারেন না। নিউমার্কেটের গেট-এ জুয়েলই প্রথম ওকে দেখলো। বউ নিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে শপিং-এ এসেছেন। কথা বলার কোনো দরকার মনে করলো না জুয়েল। শরাফত আলীই ওকে দেখে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন। আড্ডা থেকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে নিচু গলায় ওকে বললেন, 'বারেক সাহেবের সঙ্গে আজ আপনার দেখা হয়নি?'

'না হয়নি। কেন?' কাল রাতের কথা মনে হতেই ঝাঁঝ মেশানো গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলো জুয়েল।

'মিনিস্টার সাহেব আজ রাতের মধ্যে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। বারেক সাহেবকে বলেছেন খবর দিতে। পিএ আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে চারটার দিকে। আপনাকে পায়নি।'

জুয়েল একবার ভাবলো জিজ্ঞেস করে —'এত জরুরী তলব কেন?' পরমুহূর্তে মনে হলো বারেক নিশ্চয় কোনো উল্টাসিধা কথা বলেছে মোবিনউদ্দিনকে। কি বলেছে জানা দরকার। শরাফত আলীকে বললো, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

ও চলে যাবে শুনে আড্ডার সঙ্গীরা হতাশ হলো। জুয়েল ওদের পাঁচজনকে সিনেমা দেখার জন্য দুশ টাকা দিয়ে বাইরে এসে স্কুটার ধরলো।

জুয়েলের মুখে সব কথা শুনে মোবিনউদ্দিন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। বয়স মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এই বয়সে এত সব দায়িত্ব আর ঝড়ঝাপ্টা সামলাতে হয় — সে তুলনায় অন্য মন্ত্রীরা আরামেই আছেন। জুয়েলকে বললেন, 'বারেকের সঙ্গে যা হয়েছে ভুলে যাও। তোমার কোনো দোষ নেই। এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তোমার একটা গ্রুপ বারেকদের দিয়ে দাও। নতুন কেডার তৈরি করো। আমাদের সাহসী কর্মীবাহিনী দরকার যারা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা

করতে পারে। আওয়ামী লীগওয়ালারা খুবই বাড়াবাড়ি করছে।'

জুয়েল বললো, 'বারেক ভাই বলছিলেন জাহানারা ইমাম নাকি ইন্ডিয়ান এজেন্ট। তাঁকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।'

মোবিনউদ্দিন একটু হেসে অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, 'জেলে তাকে ঠিকই ঢোকাবো, তবে এখন নয়, একটু পরে। তার পেছন থেকে লোকজন একটু কমুক। এদেশের মানুষের মতো এমন হুজুগে দুনিয়ার আর কোথাও নেই। কথা নেই বার্তা নেই হই হই করে ভেড়ার পালের মতো কোত্থেকে সব এসে জুটে যায়!'

উর্দি পরা বেয়ারা এসে চা আর দামী বিস্কুট দিয়ে গেলো। চা খেতে খেতে জুয়েল বললো, 'গোলাম আযম তো জামাতের নেতা। ওর জন্য আমরা এত ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছি কেন? জামাতীরা ওদের সামলাক না!'

'গোলাম আযম তো একটা উপলক্ষ্য। ওদের মতলব হচ্ছে দেশে একটা বিশৃঙ্খলা বাঁধানো, হরতাল ডাকা, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া, সরকারী সম্পদ নষ্ট করা — এই সব। আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতে কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না, তাই জাহানারা ইমামদের দিয়ে এসব করাচ্ছে।'

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক এটা জুয়েলও চায় না। আওয়ামী লীগের মাস্তানদের সঙ্গে ওর কয়েক রাউণ্ড হয়ে গেছে। ওরা মার খেয়ে ভীষণ ক্ষেপে আছে ওর ওপর। গত নির্বাচনের সময় সূত্রাপুর কোতোয়ালির দায়িত্বে ছিলো ও। একটা হিন্দুকেও ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়নি। বারেক বলেছে, হিন্দুরা নাকি সব আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। জুয়েল না থাকলে পুরোনো ঢাকায় বিএনপি-র জেতা কঠিন ছিলো।

মোবিনউদ্দিন বললেন, 'বহু বছর পর দেশে গণতন্ত্র এসেছে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই দরকার। নয় বছর আমাদের ছেলেরা কম কষ্ট করেনি। ওদের আয়উন্নতির কথাও আমাদের ভাবতে হবে। তোমার গ্রুপের ভেতর চাকরি ব্যবসা কার কী দরকার আমাকে একটা লিস্ট করে দিও। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। আমরা নতুন লিডারশিপের ওপর জোর দিচ্ছি। আগামী বিশ পঁচিশ বছর ক্ষমতায় থাকার প্ল্যান করে আমাদের এগোতে হবে।'

কাকে কী বলে পটাতে হয় ধুরন্ধর ব্যারিস্টার মোবিনউদ্দিনের সব কণ্ঠস্থ। অনেক রাতে মন্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খেয়ে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে জুয়েল বাড়ি ফিরলো। ঘুমের ভেতর স্বপ্নে দেখলো, ও মোবিনউদ্দিনের চেয়ারে বসে আছে। আবদুল বারেক আর শরাফত আলী ওর সামনে দাঁড়িয়ে 'স্যার, স্যার', বলে অতি বিনয়ে হাত কচলাতে কচলাতে গলে যাচ্ছে।

তপুর নতুন অভিজ্ঞতা

উনত্রিশ এপ্রিল সকালে ঘুম থেকে উঠে তপু ওর মাকে বললো, 'মুড়িটুড়ি কিছু থাকলে খেতে দাও মা, আজ স্কুলে যাবো না।'

তপুদের ক্লাস শুরু হয় এগারোটায়। সাড়ে দশটায় তপু আর ওর বোন ক্লাস ফাইভের নিতু ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। ভাতের সঙ্গে ডাল আর একটুখানি আলু নয় পটল ভাজি থাকে। বিকেলে এসে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট কিংবা মুড়ি খায়। আর রাতে ডাল রুটি। সকালে রান্না সারতে সারতে তপুর মার দশটা বেজে যায়। তপু আর নিতু স্কুলে চলে গেলে তাঁর আর রান্নার ঝামেলা নেই। তিনি আর তপুর দাদী বারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে ফেলেন। তারপর দুজনে বসেন সেলাই নিয়ে। দু' বছর আগে তপুর বাবা মারা যাওয়ার পর পাড়ার তিনটা দরজির দোকানের কাপড় সেলাই করে কোনো রকমে সংসারের খরচ মেটান তিনি।

তপুর চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, বাবাও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের পর ভাইকে হারিয়ে তপুর বাবা গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন পাকিস্তানী সৈন্য আর রাজাকাররা তাঁদের ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে ছাই করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তপুর দাদা দাদী পাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তপুর বাবা তাঁদের খুঁজে বের করে ঢাকায় এসে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। তারপর শুরু করেন মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই আর চাকরির জন্য নানান জায়গায় ছুটোছুটি। সত্তর সালে গ্রামের কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বাড়িতে বসেছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন করলেও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে জানাশোনা ছিলো। তাঁদের সুপারিশে গেণ্ডারিয়ার ঢালকা নগরে বিহারীদের পরিত্যক্ত তিন কামরার ছোট্ট পুরোনো বাড়িটা তপুর দাদীর নামে বরাদ্দ করা হয়। কিছুদিন পর পার্টির এক নেতার ছাপাখানায় একটা চাকরিও জুটে যায়। যদ্দিন বেঁচেছিলেন ভালোভাবে না হলেও সংসারের হাল তিনি শক্ত হাতেই

ধরেছিলেন। তপুর দাদা বাহাত্তর সালেই মারা গিয়েছিলেন। তপুর বাবা বিয়ে করেছেন তিয়াত্তর সালে। তপুর জন্ম হয়েছে সাতাত্তর সালে। আর নিতু হয়েছে বিরাশিতে।

তপুরা দুই ভাইবোন, বাবা, মা, আর দাদী — পাঁচজনের সংসার তপুর বাবার আয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছিলো। জলজ্যান্ত সেই সুস্থ মানুষটা দু' বছর আগে অফিসের ভেতর একদিন হার্টফেল করে মরে গেলেন।

স্বামীর মৃত্যুশোক কাঁচা থাকতেই তপুর মার মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড় চেপে বসলো — সংসার কিভাবে চালাবেন! প্রথমে গেলেন স্বামীর কাজের জায়গায়। গত আঠারো বছরে দু' বার প্রেসের মালিকানা বদল হয়েছে। নতুন মালিক গোলাম কবীর জামাতে ইসলামীর লোক, তপুর বাবাকে মোটেই পছন্দ করতো না, নেহাৎ কাজ জানা লোক বলে তাড়াতে পারেনি। তপুর মাকে মোলায়েম গলায় বললো, 'মোমেন সাহেবের ইন্তেকালে আমরা সবাই খুব দুঃখিত। বড় ভালো লোক ছিলেন তিনি। আমি একাউন্টেন্টকে বলেছি আমাদের তরফ থেকে আপনাকে ওর দু' মাসের বেতন বারো হাজার টাকা দিতে। অফিস থেকে তিনি ছ মাস আগে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন। মাসে পাঁচিশ টাকা হারে শোধ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অফিসের চার হাজার টাকা পাওনা আছে। বারো হাজার থেকে ওটা কেটে রাখা হবে।'

তপুর মা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে লেখাপড়া আর বেশি করেননি। তপুর বাবার এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'ডিউটি করার সময় মারা গেছে। কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। তাছাড়া পেনশন না পাক গ্র্যাচুইটি তো পাওয়ার কথা। সব মিলিয়ে এক, দেড় লক্ষ পাওয়া যাবে।' তপুর মা প্রেস মালিককে এত সব বলতে পারলেন না। মৃদু গলায় শুধু বললেন, 'আপনাদের কাজ করতে গিয়ে তিনি মারা গেলেন। তাঁর দুটো নাবালক ছেলেমেয়ের কথা আপনারা ভাববেন না?' মালিক সে কথা শুনে রেগে গেলো — 'দু মাসের যে বেতন দেয়া হচ্ছে এটা আপনার পাওনা না, আমাদের দয়া। প্রেসের এক্সটেনশন হচ্ছে, মাথার উপর ব্যাংক লোনের বোঝা, চাইলেই তো দেয়া যায় না। অডিট কে সামলাবে?'

লোন, অডিট এসব কিছুই বুঝলেন না তপুর মা। বিষণ্ন মুখে আট হাজার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। তপুর বাবার সেই বন্ধু কদিন এসে খুব হম্বিতম্বি করলেন — 'বললেই হলো পাওনা নেই? আপনি কোর্টে যান ভাবী। ক্ষতিপূরণ দিতে তারা বাধ্য।'

তপুর মা বললেন, 'কোর্টে যাওয়ার সামর্থ কই আমার! ওরা পয়সাওয়ালা লোক। ওদের সঙ্গে মামলা করে আমরা কি জিততে পারবো!'

কোর্টে যাওয়ার সাহস কুলোয়নি তপুর মার। ব্যাংকে তপুর বাবার হাজার পনেরো টাকা ছিলো। তিন হাজার টাকা দিয়ে সেকেণ্ড হ্যান্ড একটা সেলাই মেশিন কিনেছেন। মেয়েদের জামা কাপড় সেলাই করে মাসে দেড় দু' হাজার টাকা পান। তাই দিয়ে অতিকষ্টে তাঁদের সংসার চলে।

সেদিন তপু স্কুলে যাবে না শুনে ওর মা চিন্তিত হলেন। বললেন, 'স্কুলে যাবি না কেন, শরীর খারাপ?'

তপু একটু হেসে বললো 'না মা, শরীর ঠিক আছে। আজ নির্মূল কমিটির প্রতিনিধি

সম্মেলন। সামাদ ভাই বলেছেন ন'টার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে পৌঁছতে।'

শুকনো গলায় মা বললেন, 'এসবের মধ্যে তোমার যাওয়ার কী দরকার?'

'আমরা যাবো না তো কে যাবে মা? মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে না? যারা এই ইতিহাস মুছে ফেলতে চাইছে তাদের চিনতে হবে না?'

'না হবে না।' রুক্ষ গলায় বললেন ওর দাদী। 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে তোমার পাখা গজাবে না। স্কুলে না গেলে উকিল সাহেবের কাছে যাও। গত সপ্তায় যে বাড়ি ছাড়ার নোটিস এসেছে খেয়াল আছে তোমার?'

বাবা মারা যাওয়ার সময় তপু ক্লাস এইটে পড়তো। সংসারের কোনো খবরই রাখতো না। মাঝে মাঝে শুধু বাজারে যেতো। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ও বাজার করে, ইলেকট্রিক আর ওয়াসার বিল দেয়, ঝামেলা হলে একরাম উকিলের সঙ্গে কথা বলে। এই বয়সে ও অনেক কিছু জেনে গেছে যা ওর বয়সী ছেলেরা জানে না। পরীক্ষাতেও বরাবর ফার্স্ট, সেকেণ্ড হয়। দাদীর কথা শুনে ও নরম হেসে বললো, 'নোটিস এক বছর থেকেই দিচ্ছে। বাবা থাকতেও তো দিয়েছিলো। পরে কোর্টে গিয়ে আমাদের পক্ষে রায় আনিনি? আমাদের ভয় কি? কেউ আমাদের এ বাড়ি থেকে ওঠাতে পারবে না।'

মা বললেন, 'তাই বলে স্কুল ফেলে তুমি নির্মূল কমিটি করে বেড়াতে পারো না!'

তপু মাকে বোঝালো — 'আমাদের মতো ছেলেরাই নির্মূল কমিটি করে মা। শহীদদের ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়েছে। তারা তাদের বাবা মা'র হত্যাকারীদের বিচার চাইছে। জামাতীরা সব জায়গায় যেভাবে জেঁকে বসছে আর কদিন পর ওরা আমাদের নাম নিশানা রাখবে না। জামাতীরা ক্ষমতায় এলে এ বাড়িও তোমার থাকবে না।'

তপুর মা কখনও ছেলের সঙ্গে কথায় পারেন না। বাটিতে করে মুড়ি আর চা এনে দিয়ে বললেন, 'তোমার যা খুশি করো। দুপরে বাড়ি ফিরবে তো?'

তপু হেসে বললো, 'না মা, রাতে ফিরবো। দুপুরে প্রতিনিধিরা ওখানেই খাবে।' নিজেকে সম্মেলনের প্রতিনিধি ভাবতে বেশ গর্ববোধ হচ্ছিলো ওর।

সূত্রাপুর থানার প্রতিনিধিরা সবাই সামাদ ভাইর বাসা থেকে রওনা হবে। সূত্রাপুরের আহ্বায়ক মামুন ভাই একটা মিনিবাস জোগাড় করেছেন। এখান থেকে জনাকুড়ি যাবে সম্মেলনে।

মুক্তিযোদ্ধার ছেলে হিসেবে থানা কমিটির নেতারা সবাই তপুকে স্নেহ করেন। মামুন ভাই, সামাদ ভাই এঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি হওয়ার পর তাঁরা সবাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সাড়ে আটটার দিকে তপু সামাদ ভাইর বাসায় গেলো। জনা দশেক এরই মধ্যে এসে গেছে। সামাদ ভাইকে ও জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কটায় রওনা দেবো?'

'ঠিক পৌনে নটায়।' মৃদু হেসে সামাদ ভাই ভাই বললেন, 'পাশের ঘরে যাও। টেবিলে নাশতা দেয়া আছে, চটপট খেয়ে নাও।'

তপু বিব্রত হেসে বললো, 'আমি খেয়ে এসেছি।' যদিও ও খুব ভালো করেই জানে দু মুঠো মুড়ি খেয়ে দুপুর পর্যন্ত থাকা খুব কষ্ট হবে।

সামাদ ভাই কাছে এসে ওর হাত ধরে স্নেহভরা গলায় বললেন, 'পেট ভরে খেয়ে নাও। দুপুরে কখন খাওয়া জুটবে তার কোনো ঠিক আছে?'

তপু আর আপত্তি করলো না। সামাদ ভাইর সঙ্গে পাশে খাবার ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। সামাদ ভাই নিজে একটা প্লেটে ওকে দুটো পরোটা আর ডিম ভাজি তুলে দিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর তপুদের বাড়িতে কখনও পরোটা বানানো হয়নি। আস্ত একটা ডিমও একা সে খায়নি। সামাদ ভাইর বাড়িতে সে পেট ভরে খেলো। মামুন ভাই তখন সামাদ ভাইর সঙ্গে বসে কি একটা রিপোর্ট নিয়ে কথা বলছিলেন।

সকাল সাড়ে ন'টায় তপুদের মিনিবাস ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সামনে এসে থামলো। সুন্দর গেট বানানো হয়েছে। ওদের বাসের সামনেও হলুদ ব্যানার লাগানো ছিলো। মামুন ভাই ওদের নিয়ে গেলেন প্রতিনিধিদের নাম লেখার জায়গায়। 'প্রজন্ম ৭১'-এর এক বোন এসে ওর বুকে নাম লেখা ব্যাজ এঁটে দিলো। আরেকটা কুপন হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা যত্ন করে রাখুন। দুপুরে খাবার সময় এটা দেখাতে হবে।'

জীবনে প্রথম ওকে কেউ 'আপনি' বললো। মেয়েটার বয়স বাইশ তেইশ বছর হবে। ব্যস্ত হয়ে সবাইকে ব্যাজ পরাচ্ছিলো। নিজেকে একজন বয়স্ক মানুষ ভেবে গর্ব হলো তপুর।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের গেটের পাশেই শহীদদের ছেলেমেয়েদের সংগঠন প্রজন্ম '৭১-এর দফতর। শামিয়ানার নিচে চেয়ার টেবিলে বসে ওঁরা প্রতিনিধিদের কার্ড বিলি করছিলো। একপাশে জটলা দেখে তপু এগিয়ে গেলো। টেলিভিশনের শমী কায়সার একটা চেয়ারে বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছে। দারুণ সুন্দর লাগছে ওকে। শমী কায়সারের অভিনয় ওর খুব ভালো লাগে। বইমেলায় ওর বই বেরিয়েছে 'বাবার কথা'। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ওর বাবা, নামকরা সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার। তপু ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে বইটা নিয়ে পড়েছে। পড়তে গিয়ে ওর কান্না পেয়েছিলো। ওর ইচ্ছা হলো কাছে গিয়ে অটোগ্রাফ নেয়ার। মামুন ভাই দূর থেকে ডাকলেন, 'তপু, এদিকে এসো।'

তপু ওর কাছে যেতেই ব্যস্ত গলায় বললেন, 'তুমি তো কার্ড পেয়ে গেছো। চলো ভেতরে গিয়ে বসি। সম্মেলন এখনই শুরু হবে। জাহানারা ইমাম এসে গেছেন।'

শমীর অটোগ্রাফ নেয়ার চেয়ে জাহানারা ইমামকে কাছে থেকে দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে হয়ে উঠলো তপুর। বললো, 'মামুন ভাই, আমরা একেবারে সামনে বসবো।'

মামুন ভাই হেসে বললেন, 'আগে ভেতরে গিয়ে দেখো। সামনে যদি জায়গা থাকে বসা যাবে।'

একেবারে সামনের দুটো সারি রাখা হয়েছে বিশেষ অতিথিদের জন্য। চার নম্বর সারিতে বসার জায়গা পেয়ে গেলো তপু। সামাদ ভাই ওর পাশে বসলেন। মামুন ভাইকে একজন মঞ্চে ডেকে নিয়ে গেলো।

জাহানারা ইমাম প্রথম সারিতে বসে পাশের চেয়ারের একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরা একজন ব্যস্ত পায়ে এসে ওঁকে বললো, 'আম্মা, আমরা কি এখন শুরু করবো?'

জাহানারা ইমাম ঘুরে পেছনে তাকালেন। তপুর সঙ্গে ওঁর চোখাচোখি হলো। পুরো হলঘরে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'বাইরের প্রতিনিধিরা সবাই মনে হচ্ছে এখনও আসেন নি। আমরা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।'

এত কাছে থেকে জাহানারা ইমামকে দেখে তপু রোমাঞ্চিত হলো। একবার ভাবলো, কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, 'আমি আপনার একাত্তরের দিনগুলি আটবার পড়েছি।' লজ্জায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলো না ও।

ঠিক দশটায় মঞ্চের লাল মখমলের পর্দাটা দু' পাশে সরে গেলো। মঞ্চে লম্বা টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। পেছনে দু' সারি চেয়ার। আরও পেছনে কালো পর্দায় সুন্দরভাবে লেখা — প্রতিনিধি সম্মেলন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২৯ এপ্রিল ১৯৯২।

একপাশে বক্তৃতার ডায়াস। সুদর্শন এক ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। পর্দা সরে যেতেই তিনি বললেন, 'সমবেত প্রতিনিধি ও সুধীমণ্ডলী, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের দু' শটি শাখার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। একাত্তরের ঘাতক দালালদের স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে নির্মূল করার শপথ নিয়ে যে আন্দোলন আমরা শুরু করেছি, আজকের সম্মেলনে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আমাদের প্রথম অধিবেশনের কাজ এখনই শুরু হচ্ছে। এতে জেলার প্রতিনিধিরা রিপোর্ট পড়বেন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আহ্বায়ক শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।'

হলভর্তি প্রতিনিধিদের তুমুল করতালিতে বক্তার কথা শোনা গেলো না। অনেকক্ষণ পর তালি থামলে তপু শুনলো, মাইকে বলা হচ্ছে —'আমি শ্রদ্ধেয়া নেত্রীকে অনুরোধ করছি অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য।'

জাহানারা ইমাম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে কর্ণেল জামান আর সৈয়দ হাসান ইমাম সহ আরও কয়েকজন নেতা উঠে দাঁড়ালেন। সবাই জাহানারা ইমামের সঙ্গে ধীরে ধীরে হেঁটে মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তপু চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, গোটা হল্ ভরে গেছে। অনেকে দরজার কাছে করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারা ইমাম তাঁর চেয়ারে বসার আগে প্রতিনিধিদের হাত তুলে অভিবাদন জানালেন। আরেক দফা করতালির ঝড় বয়ে গেলো হলের ভেতরে। সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্লাশ লাইটের আলো বার বার ঝলসে উঠলো। জীবনে প্রথম এ ধরনের অভিজ্ঞতায় অভিভূত হলো তপু।

অধিবেশনের শুরুতে শোক প্রস্তাব পড়লেন মঞ্চের চেয়ারে বসা এক নেতা। তারপর শহীদদের সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হলো। সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলো জাহানারা ইমামের ভাষণ শোনার জন্য।

তাঁর ভাষণ ও প্রথম শুনেছিলো মার্চের এক তারিখে প্রেস ক্লাবের সামনে। সেদিন বেশি লোক ছিলো না। তপুরা সূত্রাপুর থেকে মিছিল থেকে এসেছিলো তিরিশ জন। ফেরার সময় মামুন ভাই অবশ্য পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়েছিলেন। তারপর মার্চের তিন তারিখে ছিলো স্টেডিয়াম গেটের জনসভা। অনেক বড় হয়েছিলো সেই জনসভা।

সেখানে জাহানারা ইমামের সঙ্গে শেখ হাসিনাও ছিলেন। তপুর মজা লেগেছিলো দেখে — সভায় কারা যেন একটা মিনি ট্রাকে কাঠগড়া বানিয়ে মাঝখানে গোলাম আযমের ডামি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দু' হাত জোড় করা গোলাম আযমের চেহারা আঁকা হয়েছিলো রক্তালোলুপ ভ্যাম্পায়ারের মতো। অন্য সবার সঙ্গে তপুও ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিলো ভ্যাম্পায়াররূপী গোলাম আযমকে। এরপরও ছাব্বিশে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসেছিলো জাহানারা ইমামের ভাষণ শোনার জন্য। সেদিন মানুষের ভিড়ে তপু মঞ্চের ধারে কাছে যেতে পারেনি, ভাষণও শুনতে পারেনি। একটা গাছে উঠে দেখেছিলো, যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই শুধু মানুষ। একজন বলছিলো, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পর এই প্রথম এখানে এত লোক জড় হলো। পরদিন পত্রিকায় বেরিয়েছে, সেদিন নাকি পাঁচ লাখ লোক এসেছিলো গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার দেখতে। এপ্রিলের বারো তারিখ ছিলো সংসদ অভিমুখে যাত্রা। অন্যদের সঙ্গে সেদিনও এসেছিলো তপু। সেদিন জাহানারা ইমাম অবশ্য খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁরা সংসদে গিয়েছিলেন স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলের নেত্রীকে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য। ওটার কপি সমাবেশে বিলি হয়েছে। একখানা যত্ন করে তপু ওর কাঠের বাক্সে রেখে দিয়েছে।

ওর সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, জাহানারা ইমামের ছাব্বিশে এপ্রিলের ভাষণ। স্বামী-সন্তানহারা এক দুঃখী মানুষ নিজের শোক-তাপ-যন্ত্রণা ভুলে দেশের মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য অসুস্থ শরীরে বুড়ো বয়সে রাস্তায় নেমেছেন। বলেছিলেন, 'বাংলার মাটিতে যতদিন স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, তাদের চিরদিনের মতো উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা কেউ ঘরে ফিরে যাবো না।'

প্রতিনিধি সম্মেলনে জাহানারা ইমাম বললেন, 'আমি একজন সন্তানহারা মা। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আমাকে আম্মা ডাকে। সন্তান হারানোর দুঃখ আমি ভুলেছি হাজারটা সন্তান পেয়ে। কিন্তু এখনও এদেশে লক্ষ লক্ষ শহীদের মা গোপনে চোখের পানি মোছেন যখন দেখেন তাঁদের সন্তানের হত্যাকারীরা সমাজের সবখানে সদম্ভে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহীদের সন্তানরা বিচার চাইছে তাদের পিতামাতার হত্যাকারীর। ঘাতকদের আমরা কেউ ক্ষমা করিনি। ওরা যেভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সকল অহংকার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, এখনই যদি আমরা রুখে না দাঁড়াই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। আমি বিশেষভাবে আহ্বান জানাবো নতুন প্রজন্মকে, যারা জন্মেছে মুক্তিযুদ্ধের পরে, তোমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ো, তোমাদের পূর্বপুরুষদের চরম আত্মত্যাগের কথা তোমাদের জানতে হবে। দেশকে যদি মানুষের বাসযোগ্য করতে চাও — স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে, তিরিশ লক্ষ নিরীহ মানুষকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতেই হবে।'

তপু মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর ভাষণ শুনছিলো, বুকের ভেতর উদ্দীপনার ঢেউ বার বার আছড়ে পড়ছিলো। নিজেকে মনে হচ্ছিলো প্রচণ্ড ক্ষমতাবান একজন। তপু জানলো না ঠিক সেই মুহূর্তে কী ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে এসেছে ওদের সহায় সম্বলহীন ছোট্ট পরিবারটির ওপর।

বিপদের সমুদ্র

নিতু সব সময় তপুর সঙ্গে স্কুলে যায়। তপুদের স্কুলে যাবার পথেই পড়ে ওর স্কুল। ফেরেও তপুর সঙ্গে। এর জন্য অবশ্য আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হয় ওকে। তাতে নিতুর কোন অসুবিধে হয় না। অনেক মেয়েই থাকে। ওদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে আধঘণ্টা দেখতে না দেখতেই কেটে যায়। মাঝে মাঝে তপু না গেলে মা নিজে নিতুকে স্কুলে দিয়ে আসেন। ছুটির পর বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসেন।

সেদিন নিতুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় মা রহমত টেইলারিং শপ থেকে নতুন পাঁচটা ব্লাউজের অর্ডার এনে বাড়িতে এসে দেখেন, বন্ধ দরজার সামনে দু'জন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বয়স্ক লোকটা ঘন ঘন কড়া নাড়ছে আর বলছে, 'বাড়িতে কে আছে, দরজা খুলুন।'

মা এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা কে, কোত্থেকে এসেছেন?'

লোকটা বললো, 'আপনি এ বাড়িতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আপনারা কেন এসেছেন?'

'শেষ নোটিসে আপনাদের বলা হয়েছিলো এ মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে। আশা করি কাল বাড়ি খালি করে দিচ্ছেন?' গম্ভীর গলায় বললো ছাগুলে দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোকটা।

ভেতরে দরজার আড়াল থেকে তপুর দাদী সব কথা শুনেছিলেন। দরজা খুলে বাইরে এসে ধমকের গলায় লোকটাকে বললেন, 'বললেই বাড়ি ছাড়তে হবে — এটা কি মগের মুল্লুক? এ বাড়ি আমার নামে বরাদ্দ করা আছে। কোর্টের কাগজ আছে। কোন দুঃখে বাড়ি ছাড়বো শুনি।'

হাইকোর্টে আপনাদের রায় বাতিল হয়ে গেছে। বাড়ি আসল মালিককে বুঝিয়ে দিতে হবে। 'বাড়ির আসল মালিক আমরা।'

'বিশ বছর পর মালিক কি মাটি থেকে গজিয়েছে?'

'আপনারা খুব ভালো করে জানেন একাত্তরের গণ্ডগোলের আগেই কবীর সাহেব এ বাড়ি কিনেছিলেন। তিনি এতকাল বিদেশে ছিলেন। এখন দেশে ফিরেছেন। তাঁর বাড়ি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে আমরা তোমার কোন্ বাপের কাছে যাবো শুনি?'

রাগে তপুর দাদী রীতিমতো কাঁপছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে কেউ 'গণ্ডগোল' বললে তিনি সহ্য করতে পারেন না।

'ভদ্রভাবে কথা বলুন।' লোকটা গম্ভীর গলায় বললো, 'ঠিক সময়মতো বাড়ি না ছাড়লে আমরা অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।'

অন্য ব্যবস্থা মানে কী? 'গুণ্ডা দিয়ে তুলে দেবে নাকি? দুজন অসহায় বিধবা আর দুটো এতিম বাচ্চাকে গুণ্ডার ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে তুলে দেয়াটা খুব ভদ্র কাজ, তাই না? ভদ্রতা শেখাতে এসেছো আমাকে? আমরা এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

দাদীর কথায় লোক দুটো যে অপমানিত বোধ করছে তাদের থমথমে চেহারা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিলো। 'ঠিক আছে, দেখা যাবে' — বলে ওরা চলে গেলো।

তপুর মা ঘাবড়ে গেলেন। যে কোনো রকম ঝামেলায় তিনি ভয় পান। বললেন, 'এখন কি হবে মা? ওরা যদি গুণ্ডা নিয়ে আসে!'

'এতই সোজা নাকি? আমাদের কাছে কোর্টের অর্ডার আছে না?'

'বললো যে, হাইকোর্টে নাকি সে অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে?'

'ওটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু না। হাইকোর্টের অর্ডার থাকলে সঙ্গে পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে আসতো।'

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে মা।' ঘরে এসে কাপড় গোছাতে গোছাতে তপুর মা বললেন, 'সেদিন কাগজে দেখলাম জহির রায়হানের পরিবারকে নাকি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ গিয়েছিলো। তাদেরই যদি এমন অবস্থা হয় আমরা তো চুনোপুটি মা!'

তপুর দাদী জামায় বেতাম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'খেয়ে উঠে তুমি একবার একরাম উকিলের সঙ্গে কথা বলে এসো। ও দুপুরে খাওয়ার সময় বাসায় ফেরে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপুর মা বললেন, 'তাই যাবো মা।

ইদানীং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, শহীদ পরিবারদের থাকার জন্য সরকার পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত যে সব বাড়ি বরাদ্দ করেছিলো সেগুলো নাকি একাত্তরের আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন মালিকরা গুণ্ডা, পুলিশ এনে বাড়ি দখল নিচ্ছে। তপুর বাবা বেঁচে থাকতে এরশাদের আমলে এরকম হয়েছিলো। শেষে পরামর্শে কোর্টে গিয়ে ওটা বন্ধ করা হয়েছে।

দুপুরে খাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিলো না। দু' মুঠো ভাত মুখে গুঁজে তপুর মা গেলেন ফরিদাবাদে ওঁদের উকিল একরাম উল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তপুর মা'র কাছে সব শুনে বললেন, 'ওদের কাছে সত্যিই যদি হাইকোর্টের কোনো অর্ডার থাকে আমরা সুপ্রিমকোর্টে আপিল করবো। আপিলের রায় না হওয়া পর্যন্ত স্টে

অর্ডার চাইবো।'

স্টে অর্ডার কী জিনিস ভালো মতো বুঝতে না পারলেও তপুর মা বললেন, 'আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন।'

তপুর দাদী যতই আশ্বাসের কথা বলুন না কেন মা খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলেন না। উকিলের বাসা থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন নিতুদের স্কুলে। ছুটি হতে তখনও দুটো পিরিয়ড বাকি। হেডমিস্ট্রেসকে পরিচয় দিয়ে বললেন, বাড়িতে জরুরি কাজ। নিতুকে নিতে এসেছেন।

হেডমিস্ট্রেস দপ্তরির হাতে একটা স্লিপ দিয়ে নিতুকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠালেন। নিতু অসময়ে মাকে দেখে খুব অবাক হলো। স্কুল থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলো — 'দাদার কি কিছু হয়েছে মা? তুমি যে ছুটি না হতে নিতে এলে?'

'তোমার দাদা ঠিকই আছে।' গম্ভীর হয়ে মা বললেন, 'বাড়িতে ঝামেলা হতে পারে।'

'কি ঝামেলা মা?'

'বাড়ি গেলে দেখতে পাবে।' কথা বাড়তে দিলেন না মা।

কাঠের পুল পার হতেই ভাই ভাই রেস্টুরেন্টে তপুর এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, কয়েকবার বাড়িতে এসেছে, মন্টু নাম। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, গত বছর বাপ মরেছে বলে স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে ভাই ভাই রেস্টুরেন্টের হিসেবের কাজে লেগে গেছে। মা দুপুর থেকে ভাবছিলেন, তপুকে একটা খবর পাঠানো দরকার। কিছু যদি ঘটেই যায় বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে তপুই আছে। মন্টুকে বললেন, 'বাবা, আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'কি কাজ খালাম্মা ?'

তপুর মাকে পাড়ার অনেকেই সমীহ করে তাঁর ভদ্র আর পরোপকারী স্বভাবের জন্য। কারও কোনো বিপদ হলে সবার আগে তিনি ছুটে যান। মন্টুকে বললেন, 'তপু ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে গেছে নির্মূল কমিটির সম্মেলনে। ওকে বলবে, খুব জরুরি দরকার। এক্ষুণি যেন বাড়ি চলে আসে।'

বিব্রত গলায় মন্টু বললো, 'চারটার আগে দোকান থেকে বেরোতে দেবে না খালাম্মা। চারটায় মালিক আসবে। তাকে না বলে যাওয়া যাবে না।'

ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে তপুর মা বললেন, চারটা বাজলেই যেও। ওকে তোমার সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে খালাম্মা। আপনি ভাববেন না।'

মন্টুর কথা শুনে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন তপুর মা। তবু দোকান থেকে রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে এগোতেই অজানা সব ভয় তাঁকে আবার চেপে ধরলো।

বলতে গেলে একরকম দৌড়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। ভেবেছিলেন বাড়ির চারপাশে গুণ্ডা, পুলিশ আর অনেক লোকজন দেখতে পাবেন। সেরকম কিছু তাঁর চোখে পড়লো না। শেষ দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদে মরা ঢোঁড়া সাপের মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছে সিমেন্টে বাঁধানো আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাটা। একজন বুড়ো ফেরিওয়ালা 'ঢাকাই

শাড়ি' বলে ক্লান্ত গলায় ডেকে মোড়ের মাথায় হারিয়ে গেলো। রাস্তায় আর কোনো মানুষজন নেই। মা'র ভাবসাব দেখে খুবই অবাক হচ্ছিলো নিতু।

তপুর মা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিলেন। আজকাল একটু পরিশ্রমেই হাঁপ ধরে যায়। ডাক্তারের কাছে যান না, যদি কোনো কঠিন অসুখের নাম বলে একগাদা দামী দামী ওষুধের নামওয়ালা প্রেসক্রিপশন হাতে ধরিয়ে দেয় সেই ভয়ে। একটু ধাতস্থ হয়ে দরজার শেকল নাড়লেন। ভেতর থেকে দাদী জানতে চাইলেন, 'কে?'

নিতু গলা তুলে বললো, 'দাদী, আমরা।'

দরজা খুলে অসময়ে নিতুকে দেখে একটু অবাক হলেন দাদী — 'আজ কি আগে ছুটি হয়ে গেছে?'

মা ভেতরে ঢুকে বললেন, 'ছুটি হয়নি মা। নিয়ে এলাম। বিকেলে যদি কোনো উটকো ঝামেলা দেখা দেয় —।'

'তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো।' দাদী আশ্বাস দিয়ে জানতে চাইলেন — 'উকিল কি বললো?'

'বললেন, সত্যিই যদি ওদের কাছে হাইকোর্টের কোনো অর্ডার থাকে তাহলে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করতে।'

'আপিল করতে তো সময় লাগবে?'

'হাইকোর্টের অর্ডারের নকল পেলে কালই আপিল আর স্টে অর্ডারের জন্য দরখাস্ত দেবেন।'

মা নিতুকে ভাত খেতে দিলেন। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে নিতু বা তপু কেউই ভাত খায় না। সেদিন হাড়িতে ভাত ছিলো। আসলে তিনি নিজেই দুপুরে কিছু খেতে পারেননি। মুড়ির বদলে ভাত আগ্রহ নিয়ে খেলো নিতু। যদিও মার কথাবার্তায় ওর বেশ ভয় ভয় লাগছিলো। ওর যা বয়স সেটা হলো আনন্দ খোঁজার, বড়দের মতো দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াবার নয়।

মা'র আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করে ওরা এলো সোয়া চারটার দিকে। ও বেলার সেই লোক দুটো ছিলো, সঙ্গে জনা চারেক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আর তিনজন পুলিশ। এবার আর ভদ্রভাবে কড়া নাড়া নয়, দড়াম দড়াম করে দরজায় লাথি মারতে মারতে একটা গুণ্ডা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললো, 'অই দরজা খোল্, নাইলে ভাইঙ্গা ফালামু।'

মা আর দাদী সেলাই নিয়ে বসেছিলেন। নিতু বিছানায় শুয়ে ছবি আঁকছিলো। ড্রইং আপা ওকে বলেছেন কাল সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে নিয়ে যেতে। নিতু একটা রিকশার পেছনে আঁকা ছবিতে দেখেছিলো, পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালী মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করছে। যেটুকু মনে ছিলো সেভাবেই ছবি আঁকতে গিয়ে নিতু তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো। দরজায় বিকট শব্দ হতে ওর মনে হলো বুঝি একাত্তরের মতো পাকিস্তানী সৈন্যরা হামলা করেছে। ভয়ে চিৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরলো নিতু।

মার মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দাদীও ভয় পেয়েছেন। তবে তিনি

ঠিক করলেন, তাঁকে শক্ত থাকতে হবে। চাপা গলায় নিতু আর ওর মাকে বললেন, 'তোমরা ভেতরে থাকো, আমি দেখছি।'

দাদী উঠে দরজা খুললেন। পুরোনো দিনের ভারি দরজা বলে ততক্ষণে মাত্র দুটো কবজা আলগা হয়েছিলো। হাল আমলের দরজা আগেই ভেঙে যেতো। তাঁকে সামনে দেখে যে দরজায় লাথি মারছিলো, সে এক পা পিছিয়ে এলো। সাদা থানপরা, মাথায় বেশির ভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা, কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা, দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগে।

যে লোকটা দরজায় লাথি মারছিলো তার বয়স বেশি হলে বাইশ তেইশ হবে, চোয়াড়ে চেহারা, পেটানো শরীর, পেশাদার গুণ্ডা মনে হয়। দাদী তাকেই বললেন, 'তোমাদের বুঝি এরা টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনেছে দুটো অসহায় বিধবার বাড়িতে হামলা করার জন্য?'

লোকটা খসখসে গলায় বললো, 'আমাদের কেউ ভাড়া করে আনে নাই। আপনারা বেআইনি ভাবে এদের ঘরে আছেন।'

'আইন বেআইন দেখার জন্য তো থানা পুলিশ কোর্ট আছে বাছা! মুক্তিযুদ্ধে আমার ছেলে যখন শহীদ হয় তখন সে তোমারই বয়সী ছিলো। তুমিও তো কোনো মায়ের ছেলে। অসহায় বিধবাদের ওপর জুলুম করার শিক্ষা নিশ্চয় মা তোমায় দেয়নি। এদের কথায় তোমরা আমাদের বাড়িতে হামলা করছো, বলছো বেআইনিভাবে আছি। আমার ছেলে তোমাদের জন্য, দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। তার রক্তের বদলে এইটুকুন মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটেছিলো। সেটাও তোমরা অন্যায়ভাবে কেড়ে নিতে চাও?'

কথা বলতে গিয়ে দাদীর গলা কেঁপে উঠছিলো। পেছন থেকে বয়স্ক গুণ্ডাটা রুক্ষ গলায় বললো, 'আমরা লেকচার হুনবার আহি নাই। অই তোরা খাড়ায়া রইছস ক্যা? এক ঘণ্টার ভিতরে কাম শ্যাষ কর।'

'না।' চিৎকার করে উঠলেন দাদী। দু হাত মেলে দরজার চৌকাঠ আগলে বললেন, 'খবরদার, কেউ ভেতরে ঢুকবে না।'

সকালের সেই ছাগুলে দাড়িওয়ালা লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'তখন আপনাদের ভদ্রভাবে বলেছিলাম বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। অপমান করে তাড়িয়েছেন। এখন কোর্টের অর্ডার এনেছি। পুলিশ ফোর্সও আছে। ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে আসুন। কোথায় যাবেন বলুন, গাড়ি ঠিক করে দিই। নইলে ফল খুব খারাপ হবে।'

হইচই শুনে পাড়ার কয়েকজন লোক জড় হয়েছিলো। বয়স্ক গুণ্ডাটা পকেট থেকে পিস্তল বের করে ওদের গালি দিয়ে বললো, ' . . . গেলি! নাইলে চান্দি ফুটা কইয়া দিমু।'

ওর মারমুখী চেহারা দেখে যারা সাহায্য করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো ভয়ে এক পা দু' পা করে পিছিয়ে গেলো। আশেপাশের জানালায় বেশ কিছু কৌতূহলী মুখ দেখা যাচ্ছিলো। গুণ্ডাটা পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপঝাপ করে, জানালা দরজা সব বন্ধ হয়ে গেলো। গলিটাও ফাঁকা হয়ে গেলো চোখের পলকে।

তারপর বিশালদেহী গুণ্ডাটা এগিয়ে এসে মাছি তাড়াবার মতো করে দাদীকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিলো। বাকিগুলো সব হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো।

রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে দাদীর কপাল কেটে গিয়েছিলো। তিনি চিৎকার করে পুলিশদের বললেন, 'কটা গুণ্ডা এসে তোমাদের চোখের সামনে আমাদের ওপর হামলা করছে, তোমরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছো? প্রত্যেকের নামে আমি তোমাদের ওপরঅলার কাছে নালিশ করবো। তোমাদের কারও চাকরি থাকবে না।'

পুলিশগুলো দাদীর কথায় কোনো কানই দিলো না। একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। গুণ্ডারা ততক্ষণে নিতু আর মাকেও ধাক্কা মেরে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। নিতু ভয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলো। মা দুঃখে অপমানে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। গুণ্ডারা ঘরের জিনিসপত্র সব রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। দাদীর ঘরের দেয়ালে তপুর চাচার একটা বাঁধানো ছবি ছিলো। ওটা ভেতর থেকে উড়ে এসে সামনের বাড়ির দেয়ালে বাড়ি খেলো। ঝম ঝম করে কাঁচ ভাঙলো। অসহায় দাদী দু'হাত ওপরে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ফরিয়াদ জানালেন — 'আল্লাহ, তুমি এই জুলুমের বিচার করো। তুমি কি মাসুম এতিম বাচ্চার কান্না শুনতে পাচ্ছো না? তোমার গজব নামুক জালেমদের ওপর। . . . ' চিৎকার করতে করতে দাদীর গলা ভেঙে গেলো।

বয়স্ক গুণ্ডাটা ওর সঙ্গীদের বলেছিলো একঘণ্টার ভেতর ঘর খালি করে দিতে। ওদের দু' ঘণ্টা লেগে গেলো, কারণ তপুর মা'দের বাইশ বছরের সংসারে দরকারী অদরকারী জিনিসপত্র কম জড়ো হয়নি। বড় খাট ছিলো একটা, সেগুন কাঠের তক্তপোষ ছিলো। স্টিলের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, সেলাই মেশিন, মিটসেফ, আলনা, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বিছানা-বালিশ, রান্নার জিনিসপত্র তপুদের পড়ার বই, নিতুর কাপড়ের পুতুল, খেলনার বাক্স সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে থাকলো। বাড়ি খালি করে গুণ্ডারা বেরিয়ে আসার পর পুলিশ বাইরের দরজায় তালা মেরে গালা দিয়ে সিল করে দিলো। তারপর সবাই বীরের বেশে হেঁটে চলে গেলো।

মা আর দাদীর কাছে মনে হচ্ছিলো ঠিক একাত্তরের মতো। ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র সব হারিয়ে রাতে কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে, কোথায় দুমুঠো খাবার পাওয়া যাবে কোনো কিছুই জানা নেই। তাঁদের মনে হচ্ছিলো, দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন অজানা পথের পাশে। সামনে আর এক পা এগোবার শক্তিও নেই শরীরে। নিতুকে বুকে চেপে শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। ওদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দাদীও কান্না সামলাতে পারলেন না।

সত্যিকার বন্ধু

তপুর মার কথামতো ওকে খবর দেয়ার জন্য সোয়া চারটার দিকে দোকান থেকে বেরিয়েছিলো মন্টু। হেঁটে সদরঘাট এসে সেখান থেকে দু' বার বাস বদল করে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট যেতে যেতে ছটা বেজে গেলো। প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ পুরোদমে চলছে। বিকেলের অধিবেশনে অতিথি বক্তারা একাত্তরের ঘাতকদের দল জামাতে ইসলামী আর তার দোসরদের কিভাবে প্রতিহত করতে হবে, কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে সে বিষয়ে বলছিলেন। হলের ভেতর কোনো আসন খালি নেই। অনেকে দরজার কাছে করিডোরে দাঁড়িয়ে, অনেকে বাইরে গাছতলায় বসে বক্তৃতা শুনছিলো।

এমন ভিড়ের ভেতর তপুকে কিভাবে খুঁজবে ভাবতে গিয়ে ঘাবড়ে গেলো মন্টু। বাইরের দরজার পাশে ও দাঁড়িয়েছিলো হতভম্বের মতো। দরজার বাঁ দিকে টেবিল পেতে মুক্তিযুদ্ধের বই বিক্রি করছে দুটি তরুণ। একজনের বুকে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ আঁটা। একটু ইতস্তত করে মন্টু ওকে গিয়ে বললো, 'আপনি কি সূত্রাপূর থানা থেকে যারা এসেছে তাদের কাউকে চেনেন?'

'ক্যান চিনুম না!' সবজান্তার মতো জবাব দিলো স্বেচ্ছাসেবক — 'মামুন ভাই, সামাদ ভাই সবাইরে চিনি।'

'গেণ্ডারিয়ার তপুকে চেনেন?'

স্বেচ্ছাসেবক একটু ভেবে বললো, 'না ভাই, তপু নামের কাউরে চিনি না।'

মন্টু কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'ভেতরে সামাদ ভাইকে একটা খবর দিতে পারবেন?'

'কি খবর?'

'বলবেন, তপুর বাড়ি থেকে ওর মা জরুরী খবর দিয়েছেন। ও যেন এক্ষুণি একবার বাইরে আসে। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক আছে, খাড়াও', বলে স্বেচ্ছাসেবক ভেতরে চলে গেলো।

মন্টু টেবিলে রাখা বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। এক সময় বইপড়ার নেশা ছিলো ওর। তপুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব এই বই পড়া নিয়েই। ওরা দু'জনেই গেণ্ডারিয়ার সীমান্ত পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তো। ভালো কোনো বই পড়লে সেটা নিয়ে নিজেদের ভেতর আলোচনা করতো। বাবা মারা যাওয়ার পর স্কুল ছাড়তে হলো। যে চাকরি করে সেখান থেকে পাঠাগারে যাওয়ার সুযোগ খুব কমই ঘটে। তারপরও মাঝে মাঝে তপুর সঙ্গে পাঠাগারেই দেখা হয়।

মিনিট দশেক পরে তপু হলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ব্যস্ত পায়ে মন্টুর কাছে এসে উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলো, 'তুই কখন এলি? কি হয়েছে?'

'একটু আগে এসেছি।' মন্টু বললো, 'তোর মা বলেছেন খুব নাকি জরুরী দরকার। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কি দরকার কিছু বলেননি?'

'না। খুব পেরেশান মনে হচ্ছিলো খালাকে।'

'একটু দাঁড়া। মামুন ভাইকে বলে আসি।' বলে একরকম দৌড়ে হলের ভেতরে ঢুকলো তপু। মামুন ভাই পেছনের দিকেই ছিলেন। ওর কাছে গিয়ে চাপা গলায় বললো, 'আমাকে এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে মামুন ভাই। মা লোক পাঠিয়েছেন।'

মামুন উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, 'কোনো বিপদ হয়নি তো? আমি আসবো?'

'না, না। আপনাকে আসতে হবে না। মন্টু এসেছে, ওর সঙ্গে যেতে পারবো।'

'তাহলে দেরি কোরো না।' এই বলে পকেট থেকে তিরিশটা টাকা বের করে তপুর হাতে গুঁজে দিলেন — 'এটা রাখো। স্কুটারে করে যেও। বাসে যেতে সময় লাগবে।'

কোনো কথা না বলে কৃতজ্ঞতাভরা চোখে মামুন ভাইকে এক পলক দেখলো তপু। তারপর ছুটে বেরিয়ে এলো। মন্টুর হাত ধরে দ্রুতপায়ে রাস্তার দিকে হাঁটলো তপু। বললো, 'চল, স্কুটারে যাবো।'

মন্টুর কাছে তপুর মা'র দেয় আট টাকা মাত্র পকেটে আছে। দু' টাকা বাস ভাড়া লেগেছে। ভেবেছে, যেতে চার টাকা লাগবে, বাকি চার টাকা থাকবে ওর জন্য। ছোট ভাই দুটোর জন্য বাদাম কিনে নিয়ে যাবে। স্কুটারে যাওয়ার কথা শুনে শুকনো গলায় বললো, 'তোর কাছে ভাড়ার টাকা আছে?'

তপু বললো, 'চিন্তা করিস না। মামুন ভাই তিরিশ টাকা দিয়েছেন।'

গেট-এর বাইরে ওদিককার একটা স্কুটার ওরা পঁচিশ টাকা ভাড়াতেই পেয়ে গেলো। স্কুটার স্টার্ট দেয়ার পর তপু বললো, 'মার সঙ্গে তোর দেখা হলো কোথায়?'

'আমাদের দোকানে এসেছিলেন, আড়াইটার দিকে। নিতু ছিলো সঙ্গে। আমার বেরোতে বেরোতে চারটা বেজে গেলো। মালিক না আসা পর্যন্ত বেরোতে পারছিলাম না।'

নিতু সঙ্গে ছিলো শুনে তপু আরও চিন্তিত হলো। নিতুর ছুটি হয় সাড়ে তিনটায়। তার মানে স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই মা ওকে ক্লাস থেকে নিয়ে এসেছেন। মনে হচ্ছে কোনো বিপদে পড়েছেন। দাদীর কিছু হয়নি তো! কদিন ধরে তাঁর বুকে কফ জমে

বেদম কাশি হয়েছে। ডাক্তারের কাছে গেলে টাকা লাগবে, তাই তুলসী পাতার রস আর গরম পানি খাচ্ছেন। তিনি গত রাতে কাশির জন্য ঘুমোতে পারেন নি। কে জানে তাঁর অসুখ হয়তো বেড়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিতে হতে পারে।

বাড়ির কাছে গিয়ে সন্ধ্যার আবছা আলোয় তপু যে দৃশ্য দেখলো তাতে ওর মাথা ঘুরে গেলো। ওদের বাড়ির দরজায় মস্ত তালা দেয়া, আলমারি, খাট, চেয়ার, টেবিল, জিনিসপত্র সব বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মা, দাদী আর নিতু ওর কাঠের চৌকিটার ওপর বসে — দাদীর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পাড়ার একজন বয়স্ক মহিলা মা'র পাশে বসে নিতুর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন বলছেন। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছেন। পাশের বাড়ির হামিদ চাচা আর ওঁর ছোট ছেলে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র গুছিয়ে এক জায়গায় জড় করছেন। তপুকে দেখে মা'র পাশে বসা মহিলা বললো, 'তপুর মা, তোমার ছেলে এসে গেছে।'

তপু ছুটে এসে ভাঙা গলায় মাকে বললেন, 'কি হয়েছে মা?'

মা কোনো কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ভাইকে দেখে নিতু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। হামিদ চাচা এগিয়ে এলেন। দু' ঘণ্টা ধরে ওদের বাড়ির ওপর যে ঝড় বয়ে গেছে তার বিবরণ দিলেন। তপু শুনে রাগে দুঃখে কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলো না। মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কান্নার দাগ তখনও শুকোয় নি। ধরা গলায় হামিদ চাচাকে বললো, 'পাড়ায় আপনারা মুরুব্বিরা থাকতে কটা লোক এসে এভাবে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিলো, আপনারা কিছুই বললেন না?'

'কি বলবো বাবা!' অসহায় গলায় হামিদ চাচা বললেন, 'সারা দেশে এখন গুণ্ডাদের রাজত্ব চলছে। আমরা ক'জন তো বেরিয়েছিলাম। মিজান সাহেব ছিলেন, মতিন সাহেব ছিলেন, লাবলু ছিলো। গুণ্ডারা আমাদের বুকের ওপর পিস্তল ধরে বললো নিজেদের ঘরে যেতে। নইলে গুলি করবে। দেখলে না, গত মাসেও তো ডিস্টিলারি রোডে দিনে দুপুরে দুজন খুন হলো!'

তপু কান্না ভেজা গলায় বললো, 'আমাদের কি হবে চাচা? আমরা এখন কোথায় যাবো?'

পাড়ায় তপুদের জন্য যাদের সহানুভূতি আছে তাদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। চারজন মানুষকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা যে কারও নেই তপু তা ভালো করেই জানে। হামিদ চাচা বললেন, 'তোমার দাদীকে বলেছি, কিছু জিনিসপত্র আমাদের কয়েকজনের বাড়িতে ভাগাভাগি করে রাখতে পারি। উকিল সাহেবের সঙ্গে তোমাদের তো পরিচয় আছে। রাতটা ওঁদের বাড়িতে থাকো। কাল বসে ঠিক করবো কী করা যায়।'

এ্যাডভোকেট একরাম উল্লার বাড়ি ফরিদাবাদে। তপুদের বাসা থেকে দশ মিনিটের পথ। তপুর বাবা বেঁচে থাকতে বাড়ি নিয়ে যে মামলা হয়েছিলো, এই উকিলই তখন ওদের পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন। তপু মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, যাবো উকিল চাচার কাছে?'

মা কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মন্টু অল্প দূরে

দাঁড়িয়েছিলো। কাছে এসে তপুকে বললো, 'চল, আমিও যাই।'

একরাম উকিলের বাড়িতে এসে তপুরা ওঁর দেখা পেলো না। কাজের মেয়েটা বললো ফিরতে নাকি অনেক রাত হবে। কথাটা শুনে তপুর মনে হলো, ওকে বুঝি কেউ গভীর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হাত পা ছুঁড়ে কোনো লাভ নেই। অবধারিতভাবে সে ডুবে যাচ্ছে। মন্টু কাজের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বেগম সাহেব বাসায় আছেন?'

'হ আছেন।'

'তাঁকে বলো ঢালকানগরের মোমেন সাহেবের ছেলে ওনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কাজের মেয়েটা ভেতরে যেতেই তপু বললো, 'ওনাকে ডাকতে গেলি কেন? আমাকে তো উনি চেনেন না।'

'পরিচয় দিলে চিনবে না কেন? একরাম উকিল তোদের কেস করেছে না?'

মাঝবয়সী মোটাসোটা উকিলগিন্নি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখভর্তি পান, পিকটুকু গলায় রেখে ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার লগে কি কতা? সাহেব বাড়িতে নাই কইছে না তোমাগো?'

মন্টু বললো, 'ভারি বিপদে পড়ে এসেছি চাচী। এ হচ্ছে তপু, ঢালকানগরে থাকে। ওর বাবা মোমেন সাহেব ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা — দু' বছর আগে মারা গেছেন। একরাম চাচা ওদের বাড়ির কেস করেছেন। আজ গুণ্ডারা এসে ওদের জোর করে বাড়ি থেকে তুলে দিয়েছে। কোথাও যাবার জায়গা নেই। আজ রাতটা যদি ওদের আশ্রয় দিতেন —।'

ঢক করে পানের পিকটুকু গিলে উকিল গিন্নি বললেন, 'পারতাম, মগর আইজ সকালে আমার মাইয়া আর জামাই আইছে বেড়াইতে। অগো পোলা মাইয়া তিনটা, কামের বেটি — বাড়ির ভিতরে পা রাখনের জায়গা নাই। না বাবারা, পারুম না। অন্য কারো বাড়িত যাও।'

কথাটা উকিলগিন্নি এমনভাবে বললেন যেন তপুরা ভিক্ষা চাইতে এসেছে। লজ্জায় আর অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিলো তপু। কোনো রকমে বললো, 'একরাম চাচাকে বলবেন আমি পরে আসবো।' তারপর মন্টুর হাত ধরে চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

মন্টু ওর কাঁধে হাত রেখে ব্যাকুল গলায় বললো, 'কাঁদছিস কেন তপু! এক রাতের জন্য তোরা রহমান চাচার ফরিদাবাদ হোটেলে থাক না। জিনিসপত্র আমরা পাহারা দিয়ে রাখবো।'

কান্নাভেজা গলায় তপু বললো, 'কিভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললো দেখলি? যেন আমারা রাস্তার ফকির! বাবার কাছ থেকে কম টাকা নিয়েছে? আজ যদি বাবা থাকতেন . . .' কান্নার জন্য কথা শেষ করতে পারলো না তপু।

ওকে ধরে সামনের একটা বাড়ির রোয়াকে বসে মন্টু বললো, 'তুই শান্ত হ তপু। তোকে এ সময়ে শক্ত থাকতে হবে। বাবা তো আমারও নেই। ছোট দুটো ভাই আর মাকে নিয়ে কিভাবে সংসার চালাচ্ছি দেখছিস না? আমাদের চেয়ে তোদের অবস্থা

অনেক ভালো। তোরা দুই ভাইবোন স্কুলে যাচ্ছিস। গ্রামে এখনও তোদের মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। কেন এত ভেঙে পড়ছিস?'

বয়েসে মন্টু তপুর চেয়ে বছর খানেকের বড় হবে। তার চেয়ে বড় কথা — বাবা মারা যাওয়ার পর গত এক বছর সংসার চলছে একরকম ওর নিজের রোজগারের টাকায়। এই এক বছরে এত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ওর কথা শুনে মনে হয় বয়স্ক কেউ। মন্টুর কথার জবাব না দিয়ে তপু ওর হাত আঁকড়ে বসে থাকলো।

চারপাশে ততক্ষণে আকাশ কালো করা অন্ধকার নেমেছে। একরাম উকিলদের গলিতে লোকজনের চলাচল কমে গেছে। অল্প দূরে লাইটপোস্টে শেড ছাড়া কম পাওয়ারের ন্যাড়া বাল্ব হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে। তপুর বুকের ভেতর শূন্যতার এক অদ্ভুত অনুভূতি হাহাকার করছিলো। বাবা মারা যাওয়ার পর নিজেকে যেরকম অসহায় মনে হয়েছিলো এখন তার চেয়ে আরও বেশি অসহায় মনে হচ্ছে। মন্টু যতই বলুক ওদের অবস্থা ততটা খারাপ নয়, তপু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো ওকেও পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কোথাও কাজে ঢুকতে হবে। বস্তিতে কম ভাড়ার কোনো বাসায় গিয়ে উঠতে হবে। নিতুও আর স্কুলে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর মন্টু বললো, 'চল তপু, খালারা অপেক্ষা করছেন।'

'গিয়ে কী বলবো! তারা তো জানেন আমি একরাম উকিলের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেই যাবো।'

'একরাম উকিলের জন্য অপেক্ষা করবি?'

'না করে উপায় কী?'

'আমি বলছিলাম, আজকের রাতটা ফরিদাবাদ হোটেলে থাকলে পারিস।'

তপু ম্লান হেসে বললো, 'খরচ কত পড়বে হিসেব করেছিস? চারজনের থাকা খাওয়া মিলিয়ে বলতে গেলে দু'শ টাকার ধাক্কা। মা সামাল দিতে পারবেন না। গুণ্ডারা হামলা করার সময় টাকাপয়সা কিছু রেখেছে?'

মন্টু একটু ভেবে বললো, 'হামিদ চাচা যে বললেন তোদের জিনিসপত্রগুলো সবাই ভাগাভাগি করে রাখবেন। তোরাও আপাতত ভাগাভাগি করে থাক না। তুই আমার সঙ্গে থাকতে পারিস।'

তপু মাথা নাড়লো — 'জিনিস রাখা এক কথা আর মানুষের দায়িত্ব নেয়া আরেক কথা। আমাদের অবস্থা সবাই জানে। ভাববে, একবার থাকতে দিলে যদি আর না যায়!'

'তাহলে কি করবি?'

'একরাম উকিলের সঙ্গে কথা বলবো। ওরা কোর্টের কাগজ পায় কী করে? তাঁর কী কোনো দায়িত্ব নেই? গতবার মামলা জেতার পর একগাদা টাকা নিয়ে বাবাকে বললেন আর কোনোদিন নাকি আমাদের এ বাড়ি থেকে হটানো যাবে না। দিনে দুপুরে কটা গুণ্ডা এসে আমাদের এভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিলো! তিনি কিছুই করবেন না?' কথা বলতে গিয়ে ভেতরে জমে থাকা রাগ চেপে রাখতে পারলো না তপু।

মন্টু ভাবলো, এটাই ভালো। একরাম উকিলের সঙ্গে নরমে গরমে কথা বলতে হবে। মিন মিন করে আশ্রয় চাইতে গেলেই রাস্তার ফকির ভাববে।

রাত দশটায় জুয়েলের দেখা করার কথা মন্ত্রী মোবিনউদ্দিনের সঙ্গে। সারাদিন কেটেছে আড্ডা দিয়ে। সন্ধ্যে বেলা নিউমার্কেটের দক্ষিণ গেট-এ জমিয়ে আড্ডা দিয়েছে। রাত আটটার দিকে মেয়েদের আনাগোনা কমে যাওয়ার পর আড্ডাটা ওর পানসে মনে হচ্ছিলো। কাগজিটোলার কাঠ মঞ্জু পুরো এক প্যাকেট স্টার-এ গাঁজা ভরে এনেছে। জমিয়ে টানছিলো সবাই। জুয়েল হাঁসের মতো গল গল করে মদ খেতে পারে, তবে গাঁজা ওর ভালো লাগে না। আড্ডার মজা কমে যাওয়ার পর ওর মনে হলো, মোবিন ভাইর বাড়ি যেতে হলে একটু ফিটফাট হওয়া দরকার। গায়ের সারাদিনের ধুলো আর ঘামের বিটকেল গন্ধ নিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি যাওয়া ঠিক না। ঠিক করলো, বাড়িতে গিয়ে ভালোমতো গোসল করবে। গত তিনদিন শেভ করা হয়নি। যাওয়ার পথে ব্লু নাইল থেকে শেভ করে নেবে। তারপর জামা কাপড় পাল্টে কোলন স্প্রে মেখে ফুরফুরে হয়ে নটার দিকে বাড়ি থেকে বেরোবে। এসব কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনটা আরও হালকা হলো।

আটটার দিকে জুয়েলের স্কুটার ওর বাড়ির কাছে এসে থামলো। স্কুটারওয়ালাকে বললো লাইটপোস্টের নিচে থামতে, এক শ' টাকার নোট ভাঙাতে হবে। তিরিশ টাকা ভাড়া দিয়ে বাকিটা মানিব্যাগে রাখতে রাখতে সামনে তাকিয়ে দেখলো, ওর বাড়ির সামনের খোলা বারান্দায় দুটো ছেলে বসে আছে। এ পাড়ার কোনো ছেলের এত সাহস নেই জুয়েলের বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়। নিশ্চয় অন্য পাড়ার ছেলে। জুয়েলের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়লো। ছেলে দুটোকে ধমক লাগাবে ভেবে কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। একটা ছেলেকে চেনা মনে হলো। হালকা পাতলা গড়ন, মায়াবী চোখ, কোথায় দেখেছে ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো নির্মূলওয়ালাদের জনসভার কথা। ট্রাফিক আইল্যান্ডে এই ছেলেটাকেই ও বাদাম খেতে দিয়েছিলো। অপু না কী যেন নাম।

জুয়েলকে ওদের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মন্টু আর তপু একটু বিব্রত হলো। জুয়েল জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা এখানে কি করছো?'

তপু ধরা গলায় জবাব দিলো, 'একরাম উকিলের জন্য অপেক্ষা করছি। ওর সঙ্গে দরকার আছে।'

'তুমি আমাকে চিনতে পারছো?' তপুর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো জুয়েল।

লাইটপোস্টের সামান্য যেটুকু আলো এ পর্যন্ত এসেছে তাতে অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি। আধো অন্ধকারে জুয়েলকে চিনতে না পেরে তপু মাথা নাড়লো।

'নির্মূলের জনসভায় দেখা হলো। তোমাকে বাদাম খাওয়ালাম, ভুলে গেলে?'

চিনতে পেরে বিব্রত গলায় তপু বললো, 'অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি।'

জুয়েল মৃদু হাসলো — 'একরাম উকিল কখন আসে ঠিক আছে? তোমরা

ভেতরে এসে বসো। আমাকে চেনো তো? লোকে আমাকে মাস্তান জুয়েল বলে ঠিকই, আসলে লোকটা আমি তত খারাপ নই, যতটা লোকে বলে।'

তপু আর মন্টু নিজেদের ভেতর চোখ চাওয়াচাওয়ি করলো। মন্টু ইশারায় যেতে বললো। জুয়েল দরজার তালা খুলে বাইরের ঘরের লাইট জ্বালিয়ে আবার ওদের ডাকলো, 'এসো।'

তপুর ওপর সেদিন ওর রাগ হয়েছিলো। পরে যখন ওর মনে হলো ছেলেটা সারাদিন কিছু খায়নি তখন কেমন যেন মায়া লাগছিলো। চেহারাটাও মায়া কাড়ার মতো।

তপু আর মন্টু ঘরে ঢুকলে জুয়েল প্লাস্টিকের বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললো, 'বসো। তোমাদের বাসা তো এদিকেই।'

ম্লান হেসে তপু বললো, 'হ্যাঁ, আজ দুপুর পর্যন্ত ছিলো।'

'মানে?' তপুর কথায় অবাক হলো জুয়েল।

ওদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা জুয়েলকে খুলে বললো তপু। ওর কেন যেন জুয়েলকে মাস্তান নয় এমন একজন সহানুভূতিশীল মানুষ মনে হচ্ছিলো, যাকে সব কথা বলা যায়। পুরোনো ঢাকার রংবাজ আর মাস্তানদের ত্রাস জুয়েলের মনের এই নরম কোণটির কথা খুব কম লোকই জানে। তপুর মুখে ওদের বিপদের কথা শুনে ও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। যত জায়গায় ও মাস্তানি করুক, কখনও মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক একটা খারাপ কথা পর্যন্ত বলেনি। তপুকে বললো, 'যে গুণ্ডারা এসেছিলো, তোমার মা দাদী ওদের চিনতে পারবেন?'

'পারবেন। পাড়ার অনেকে ছিলেন তখন।'

'অনেকে থেকে কি করেছেন? মাছি মেরেছেন বুঝি!'

তপু চুপ করে রইলো। পিতৃহীন অসহায় বালকটির জন্য গভীর মমতায় জুয়েলের বুক ভরে গেলো। তপুর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'তুমি এত ভাবছো কেন? একরাম উকিল এক নম্বরের হারামি। ওকে আমি ভালো করে চিনি। শয়তানটা ঠিক তোমাদের শত্রুপক্ষের টাকা খেয়েছে। মন্টু আর তুমি এখনই গিয়ে মা, দাদী আর বোনকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসো।'

তপু কি বলবে ভেবে পেলো না। হতবাক হয়ে জুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পৃথিবীতে এমন মানুষ থাকতে পারে এটা ওর ধারণার বাইরে। জুয়েল মৃদু হেসে বললো, 'এই নাও চাবি। তোমার কাছে রাখো। আমি একটু পরে বাইরে যাবো।। ফিরতে রাত হবে। ফরিদাবাদ হোটেলের ম্যানেজারকে আমার নাম করে বলবে, বাসায় পাঁচ জনের খাবার পাঠিয়ে দিতে। মন্টু এখানে খেয়ে যাবে। কাল থেকে খালা রান্না করবেন। তোমার মাকে আমি খালা ডাকতে পারি তো?'

নতুন আশ্রয়

রোজকার মতো ঠিক ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে গলা খুলে বোম্বাই ছবির নতুন হিট গান 'তুঝে আপনা বানানে কী কসম' গাইতে গাইতে জুয়েল খালি গায়ে বারান্দার ওপাশে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, বারান্দায় তারের ওপর দুটো সাদা শাড়ি শুকোতে দেয়া হয়েছে। ন' দশ বছরের মেয়ের একটা ফ্রকও আছে সেখানে। গত রাতের কথা মনে পড়তেই জিব কামড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো জুয়েল। আলনা থেকে গত রাতের খুলে রাখা জামাটা গায়ে দিয়ে বোতাম আঁটতে আঁটতে গলা তুলে তপুকে ডাকলো।

দূর থেকে তপু জবাব দিলো — 'আসছি ভাইয়া।'

দু' মিনিট পর তপু ছোট একটা ট্রেতে চা আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকলো। লাজুক হেসে বললো, 'আপনার চা।'

জুয়েল অবাক হয়ে বললো, 'চা কে আনলো?'

'মা বানিয়েছেন।'

'চুলো পেলেন কোথায়?'

'আমাদের একটা কেরোসিনের চুলো আছে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জুয়েল বললো, 'ফাইন চা তো!' কয়েক চুমুকে কাপ খালি করে বললো, 'চা বানিয়েছেন ঠিক আছে। রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে মানা করো। ফরিদাবাদ হোটেলে আমার মাস চুক্তি। নাশতা বলো আর ভাত বলো কোনোটারই অসুবিধে হবে না। বাইরে যাওয়ার পথে আমি বলে দেবো রোজ দু' বেলা ভাত আর সকাল বিকালের নাশতা বাসায় দিয়ে যেতে। মাছ, গোশত যেটা খেতে চাও বললেই হবে।'

তপুর মা কখন দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জুয়েল টের পায়নি। কথা শেষ

করে মাথা ফেরাতেই মা'র ওপর ওর চোখ পড়লো। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'কাল অনেক রাতে ফিরেছিলাম, আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তপুকে বলছিলাম —।'

মৃদু হেসে ওকে বাধা দিয়ে মা বললেন, 'আমি সব শুনেছি। হোটেল থেকে এনে কত খাওয়াবে? বাড়ি নিয়ে মামলা কদ্দিন চলে তার কোনো ঠিক আছে! রান্না আমিই করবো। তোমার রান্নাঘরে গ্যাসের লাইন আছে, শুধু চুলো নেই। আজ হোটেলে খেলেও কাল থেকে তুমিও বাড়িতে খাবে।'

মার কথা শেষ না হতেই দাদী এসে ঘরে ঢুকলেন। জুয়েলের কাছে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কাল রাতে আমি নফল নামাজ পড়ে তোমার জন্য অনেক দোয়া করেছি বাবা। যে মা তোমায় জন্ম দিয়েছে তার জন্যেও দোয়া করেছি। দুটো এতিম বাচ্চা আর অসহায় বিধবাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি যে সওয়াবের কাজ করেছো, হাশরের মাঠে এর ফল তুমি নিশ্চয় পাবে।'

জুয়েল বিব্রত গলায় বললো, 'বাড়ি তো খালিই পড়ে থাকে। আপনাদের বিপদের সময় থাকতে দিয়েছি এ আর এমন কী কথা! খালা, যদি নিজের হাতে রান্না করতে চান আমি খুশিই হবো। আজই চুলো লাগাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তপু, তাহলে নাশতার কথা বলে এসো।'

মা বললেন, 'হোটেলের মতো ভালো হয়তো হবে না। নাশতা আমি বানাতে বসে গেছি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও। ততক্ষণে নাশতা হয়ে যাবে।'

জুয়েল খুশি মনে বাথরুমে ঢুকলো। কাল রাতে মন্ত্রীর সঙ্গে ভালোমতো কথা হয়নি। মন্ত্রীর নাকি জরুরী এক কেবিনেট মিটিং ছিলো। ফিরতে ফিরতে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। ওকে বসার ঘরে অপেক্ষা করতে দেখে বললেন, 'সরি জুয়েল, আর্জেন্ট মিটিঙ ছিলো, আজ খুব টায়ার্ড লাগছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। কাল দশটায় সেক্রেটারিয়েটে এসো।'

এত তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর সুনজরে পড়ে যাবে জুয়েল ভাবতেই পারেনি। বারেকরা তো সুযোগ পেলেই ওর নামে মন্ত্রীর কান ভারি করছে। বারেককে ডিঙিয়ে মন্ত্রী ওর সঙ্গে কথা বলবেন এটা ক'দিন আগেও ধারণার বাইরে ছিলো।

নাশতা খেয়ে কালো কডের প্যান্টের সঙ্গে হালকা নীল শার্ট পরে জুয়েল সাড়ে নটায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। নাশতা কি আনতে হবে জুয়েল বলে দিয়েছিলো। হোটেলের বেয়ারা এসে পরোটা, ডিমের অমলেট আর ডাল-গোশত দিয়ে গেছে। ফ্লাস্কে করে চাও এনেছিলো। বহুদিন পরে তপুরা সবাই এত ভালো নাশতা খেলো, যদিও জুয়েল বেয়ারাকে ধমক দিয়েছিলো কলা আনেনি বলে।

যাবার আগে জুয়েল তপুর মাকে বলেছে ও বেশির ভাগই রাত করে বাড়ি ফেরে। ওর খাটটা বাইরের ঘরে সরিয়ে দিতে, যাতে অনেক রাতে কাউকে বিরক্ত করতে না হয়। ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। আর বলেছে, বিকেলের মধ্যে মিস্ত্রি এসে গ্যাসের চুলো বসিয়ে দেবে।

জুয়েল বেরিয়ে যাওয়ার পর মা তপু আর নিতুকে বললেন, 'আজ তোদের স্কুলে

যাওয়ার দরকার নেই। আর এ বেলা আমরা সবাই মিলে বাড়িটাকে গুছিয়ে ফেলি।'

মার কথা শুনে তপু আর নিতুর আনন্দ আর ধরে না। মহা উৎসাহে সবাই কাজে লেগে গেলো। বাড়ির কাজের জন্য একটা ঠিকে ঝি আসে রোজ আটটার দিকে। ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছে এঁটো গ্লাস প্লেট ধুয়ে দশটার আগে চলে যায়। জুয়েল বলেছে ও নাকি চারদিনের ছুটি নিয়েছে। তিন দিন হয়ে গেছে। কাল কাজে আসবে। তপুর মা আর দাদী ঘরের সব কাজ নিজেরাই করেন। ঝিয়ের জন্য বসে না থেকে তপু আর নিতুকে নিয়ে দুপুরের তাঁরা আগেই বাড়ির চেহারা বদলে ফেললেন।

জুয়েল প্রায় সারাদিনই বাইরে থাকে। ঘরের কোণে জমে থাকা ঝুল, খাটের তলার ময়লা, রান্নাঘরে বাতিল জিনিসপত্রের আবর্জনা আর চেয়ার টেবিলে জমে থাকা ধূলোর দিকে নজর দেয়ার সময় নেই ওর। সকালে বাইরে বেরোবার তাড়া থাকে। রাতে যখন ও ঘরে ফেরে তখন অন্ধকারে এসব চোখে পড়ে না। জুয়েলের জন্য বাইরের ঘরে ওর খাট, ড্রেসিংটেবিল, ওয়ার্ডরোব, টেলিভিশন আর তিনখানা বেতের চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া হলো। বিছানার ময়লা চাদর আর বালিশের ওয়াড় মা কেচে দিয়েছিলেন জুয়েল বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই। কড়া রোদে দুপুরের ভেতর সব শুকিয়ে গেছে। মাঝখানের ঘরটা হয়েছে ডাইনিং রুম আর তপু-নিতুর পড়ার জায়গা। বারান্দার এ ধারের ঘরটায় তপুদের বড় খাট আর তক্তপোষ পাতা হয়েছে। তপু তক্তপোষে শোয়, মা, দাদী আর নিতু শোয় বড় খাটে।

সেলাইর কাজ ফেলে মা'র ঘর গোছানো দেখে দাদী বললেন, 'মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে এসেছো। এত সব কেন করছো? কবে চলে যেতে বলে তার ঠিক আছে!'

মা আহত গলায় বললেন, 'যে কদিনই থাকি, এমন বিপদে যে আশ্রয় দিয়েছে ওর জন্য কিছু করবো না!'

'তা কর! তবে দুদিনের সেলাই জমে গেছে। কাল রহমত আসবে সালোয়ার-কামিজগুলো নিতে।'

একটা বাঁশের মাথায় কাপড় বেঁধে ছাদের ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে মা বললেন, 'রাতের ভেতর সব শেষ করে ফেলবো।'

দুপুরে ফরিদাবাদ হোটেল থেকে খাবার দিয়ে গেছে। ভাতের সঙ্গে আলু দিয়ে রুই মাছ রান্না, পটল ভাজি আর মুড়িঘন্ট। নিতু খেতে খেতে তপুকে বললো, 'দাদা, মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ির দাওয়াত খাচ্ছি।'

মেয়ের কথা শুনে মার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। নিতু কবে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে তার মনে নেই। ওর ধারণা বিয়ে বাড়িতে বুঝি বড় বড় রুই মাছের টুকরো খেতে দেয়। তপু বন্ধুদের অনেকের বড় ভাইবোনের বিয়ে খেয়েছে। নিতুর কথা শুনে ও হেসে ফেললো — 'বোকা মেয়ে। বিয়ে বাড়িতে বিরানি, রেজালা, রোস্ট এসব খেতে দেয়। ওখানে কেউ মাছ-ভাত খায় না।'

নিতু বললো, 'জুয়েল ভাইয়াকে বলবো একদিন বিরানি খাওয়াতে।'

দাদী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাংলার মতো এমন কথা বললে চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো।'

নিতু দমে গিয়ে বললো, 'বা রে, জুয়েল ভাইয়াই তো সকালে বললেন, যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে বলার জন্য।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে, সামনের শুক্রবারে আমি তোদের বিরানি রেঁধে খাওয়াবো।'

নিতু মহা উৎসাহে প্রশ্ন করলো, 'সত্যি মা! তুমি বিরানি রাঁধতে পারো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, 'বিরানি কেন মা, রেজালা, রোস্ট, জর্দা, ফিরনি সবই রাঁধতে পারি।'

বাবা বেঁচে থাকতে ঈদের দিনে মা পোলাও কোর্মা রাঁধতেন। বিরানি খেতে কেমন নিতুর জানা নেই। ওর মনে হলো, কাল ওদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়াতে ভালোই হয়েছে। ও বাড়িতে থাকলে মা কোনোদিন বিরানি রান্নার কথা বলতেন না। কথাটা বলতে গিয়ে দাদীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো।

তপুদের খাওয়া শেষ হওয়ার একটু পরই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। মা ভাবলেন হোটেলের বেয়ারা বুঝি টিফিন ক্যারিয়ার নিতে এসেছে। দরজা খুলে দেখেন দুটো গ্যাসের চুলো হাতে এক লোক। মাকে বললো, 'আমারে জুয়েল ওস্তাদে পাঠাইছে। আপনেগো গ্যাসের চুলা ফিট করনের লাইগা আইছি।'

জুয়েলকে যেভাবে লোকটা ওস্তাদ বললো শুনতে তাঁর মোটেই ভালো লাগলো না। শুকনো গলায় বললেন, 'ভেতরে এসো।'

লোকটাকে রান্নাঘর দেখিয়ে দিয়ে মা তপুকে এসে বললেন, 'জুয়েলকে গ্যাস মিস্ত্রি ওস্তাদ কেন বললো? ও কি মাস্তানি করে?'

তপু একটু ইতস্তত করে বললো, 'ঢাকাইয়ারা সবাইকে ওস্তাদ বলে মা। আমাদের স্কুলের ছোকরা পিয়নটা আমাকে ওস্তাদ বলে।'

'আমি তো শুনেছি গুণ্ডা, মাস্তানরা এসব কথা বলে।' মা একটু বিরক্ত হয়ে তপুকে বললেন, 'তোমার কারও ওস্তাদ হওয়ার দরকার নেই।'

আধঘণ্টার মধ্যে চুলো দুটো লাগিয়ে গ্যাস মিস্ত্রি চলে গেলো। মা দুটো চুলোয় গরম পানি বসিয়ে দিলেন। আগের বাড়িতে সবাই ফুটোনো পানি খেতো। এখানে এসে ভাবছিলেন কেরোসিনের চুলোয় কী করে এত পানি ফুটাবেন।

এ বাড়িতে এসে মার এত আগ্রহ নিয়ে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হওয়াটা দাদীর পছন্দ হচ্ছিলো না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বৌমা, এ বাড়িতে আমরা কি পাকাপোক্তভাবে থাকতে এসেছি?'

'তা কেন হবে মা?'

'তোমার কাজকর্ম দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। নিজেদের বাড়িটা যে হাতছাড়া হয়ে গেলো — উকিলের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে না?'

'তপু তো কাল রাতে খবর দিয়েছিলো একবার আসতে। বোধহয় কোর্ট থেকে ফেরার পথে আসবেন।'

'এলে তো ভালোই। নইলে রাতে তপুকে নিয়ে তুমিই যাবে। যদি বোঝ ওপক্ষের টাকা খেয়েছে, তাহলে অন্য উকিল ধরতে হবে।'

'ঠিক আছে মা। একরাম উকিলকে দিয়ে কাজ না হলে জুয়েলকে বলবো ভালো একটা উকিল ঠিক করে দিতে।'

'জুয়েলকে এসব কাজে জড়ানো কি দরকার? তুমি বরং আমাদের হামিদ মিয়ার সঙ্গে কথা বলো।'

একেবারে অজানা অচেনা একটা ছেলে গায়ে পড়ে কেন ওঁদের জন্য এত করছে এ নিয়ে দাদী কাল রাত থেকেই খুব চিন্তিত আছেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলেন — 'ছোঁড়ার কোনো মতলব নেই তো?' অবশ্য জুয়েলের কাছে তাঁর মনের ভাব গোপনই রেখেছেন।

বিকেলে মা আর দাদী সেলাই নিয়ে বসেছেন তখনই কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো। তপু আর নিতু বড় খাটে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল থেকে কম পরিশ্রম করে নি ওরা। মা উঠে দরজা খুললেন। কুচকুচে কালো জুয়েলের বয়সী একটা ছেলে, ওঁকে দেখে সাদা দাঁত বের করে একগাল হেসে হাত তুলে বললো, 'সেলামালেকুম খালা। আপনে তো তপুর মা?'

মা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আমার নাম কালা রশিদ। জুয়েল ওস্তাদে কামে যাওনের সময় আমারে কয়া গ্যাছে বিকালে বাজার কইরা দিতে। বাজার আনছি। লন, বুঝায়া দি।'

কালা রশিদের পেছনে একটা ঝাঁকা মুটে ছিলো। মা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। মুটেকে সঙ্গে নিয়ে রশিদ সোজা রান্নাঘরে চলে গেলো। ওর ঘরে ঢোকার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, এ বাড়ির ভেতরটা ওর অচেনা নয়। মুটের মাথা থেকে ঝাঁকা নামিয়ে কালা রশিদ ডাকলো — 'খালা আহেন। মাল সামান বুজ কইরা লন।'

মা রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালেন। ঝাঁকার ভেতর থেকে নানা আকারের ঠোঙা নামিয়ে কালা রশিদ বলতে লাগলো কোন্‌টায় কী আছে। চাল, ডাল থেকে শুরু করে যাবতীয় মশলা, তেল, তরকারি, মাংশ সবই এনেছে। মুটেকে বিদায় করে ও বললো, 'ওস্তাদে মাছের কথা ভি কইছিলো। সূত্রাপুর বাজারে বিকালে মাছ বেশি সুবিধার ওঠে না। কাইল ঠাটারি বাজার থেইকা আইনা দিমু।'

মাছের ব্যাপারে আগ্রহ না দেখিয়ে মা বললেন, 'রশিদ, তুমি চা খাবে?'

লাজুক হেসে কালা রশিদ বললো, 'খামাখা আপনে ঝামেলা করবেন ক্যান?'

'কোনো ঝামেলা হবে না।' বলে মা চুলোয় বসিয়ে রাখা গরম পানি কাপে তুলে ছাকনিতে পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেন। তারপর দুধ চিনি মিশিয়ে কালা রশিদকে চা খেতে দিয়ে স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন — 'জুয়েলকে তোমরা সবাই ওস্তাদ বলো কেন?'

'কন কী খালা?' চায়ে চুমুক দিয়ে ও বিষম খেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হয়ে বললো, 'ওস্তাদরে ওস্তাদ কমু না তো কারে ওস্তাদ কমু?'

'ও তোমাদের ওস্তাদ হলো কি ভাবে?'

একগাল হেসে কালা রশিদ বললো, 'পুরান ঢাকার এমন কুন রংবাজ পয়দা অয়

নাই — জুয়েল ওস্তাদের লগে টক্কর দিবার পারে। যাগো খায়েশ অইছিলো টক্কর দ্যাওনের, ওস্তাদে হ্যাগোরে বেহেশতের টিকিট কাইটা দিছে।'

'তার মানে জুয়েল খুন করেছে?'

'করন লাগছে। নাইলে হ্যারাই ওস্তাদরে ফিনিশ কইরা দিতো!'

'মানুষ খুন করে ও এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি করে?'

'ওস্তাদরে কিছু কওনের বুকের পাটা কারো নাইক্যা। মন্ত্রী মিনিস্টাররা ওস্তাদরে খাতির কইরা কতা কয়।'

কালা রশিদের কথা শুনে তপুর মা হতভম্ব হয়ে বসে থাকলেন। চা শেষ করে কালা রশিদ বললো, 'ওস্তাদে কইলো আপনেগো নিকি গুণ্ডা দিয়া বাড়িত থেইকা বাইর কইরা দিচ্ছে! ওস্তাদে যদি একবার খবর পাইতো — '

'ঠিক আছে রশিদ, তুমি এখন যাও।' শক্ত গলায় রশিদকে বিদায় করে মা দাদীর সঙ্গে সেলাই নিয়ে বসলেন। জুয়েলের কথামতো রশিদ বাজার করে এনেছে এ কথা ঘরে বসেই দাদী টের পেয়েছিলেন। মাকে বললেন, 'জুয়েল ছেলেটাকে ভালোই তো মনে হচ্ছে। ভেবেছিলাম বুঝি কোনো মতলব আছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের মতো চুনোপুটিকে দিয়ে ওর এমন কোন্ মতলব হাসিল হবে!' একটু থেমে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদী আপন মনে বললেন, 'আল্লাহ্পাক কার দিলে কী রকম রহম দেন কেউ বলতে পারে না।'

দাদীর কাছে মা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলেন না। একরাম উকিল সাধারণত পাঁচটার দিকে বাড়ি ফেরেন। সাড়ে পাঁচটায় সবাইকে চা বিস্কুট খাইয়ে তপুকে নিয়ে তিনি উকিলের বাসায় গেলেন।

সবে মাত্র কোর্ট থেকে ফিরেছেন একরাম উকিল। তখনও বাড়ির ভেতরে যাননি। চেম্বারে মুহুরির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তপুর মাকে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'আমি একটু পরেই জুয়েলের বাসায় যাচ্ছিলাম আপনার সঙ্গে কথা বলতে। কাল অনেক রাতে ফিরেছি। জুয়েল বুঝি আপনাদের আত্মীয়?'

মা শুকনো গলায় বললেন, 'আত্মীয় নয়, পরিচিত। আমাদের বাড়ির কী হবে কিছু ভেবেছেন?'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ভাবী। ও বাড়ি যদি আপনারা নাও পান সরকার আপনাদের অন্য ব্যবস্থা না করে এভাবে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে না।'

'না পারলেও তো করে ফেলেছে। কবে অন্য ব্যবস্থা হবে তার কোনো ঠিক আছে?'

'আমি কালই স্টে অর্ডারের জন্য আপিল করবো। যতদিন অন্য ব্যবস্থা না করে ততদিন যেন এ বাড়িতে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা করবো।'

মা শান্ত গলায় বললেন, 'উকিল সাহেব, এ পর্যন্ত যে কটা শহীদ পরিবারকে সরকার নিজেদের বরাদ্দ করা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে তারা কেউ বাড়ি পায়নি।'

'অন্যরা পায়নি বলে আপনিও পাবেন না এটা কোনো কথা হলো না। আপনাদের কেস আগেও আমি করেছি। বাড়িটা হাতছাড়া হওয়াতে একটু অসুবিধে হতে পারে।

আমি বরং একটা পরামর্শ দিই। আপনি জুয়েলকে বলেন ওর দলের ছেলেদের দিয়ে আপনাদের ও বাড়িতে তুলে দিতে। বাড়ি নিজেদের পজেশনে থাকলে মামলায় আমাদের হারাতে পারবে না।'

'জুয়েল আজ তুলে দেবে, কাল আবার ওদের গুণ্ডারা এসে নামিয়ে দেবে। জুয়েল কি চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের পাহারা দিয়ে রাখবে?'

'মুশকিলে ফেললেন।' একটু ভেবে একরাম উকিল বললেন, 'এক কাজ করুন ভাবী। জুয়েলকে বলুন কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। আপনাদের যা অবস্থা কোর্ট ফি-এর টাকাও তো মনে হয় দিতে পারবেন না।'

মা'র সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করলেন একরাম উকিল। কথাটা তিনি মিথ্যে বলেননি। হাতে সব মিলিয়ে শ' খানেক টাকাও হবে না। ছ-সাত তারিখের আগে সেলাইর কোনো টাকা পাবেন না। তখনও কী মাসের পুরো টাকা একবারে পাবেন? মোটেও না। এক এক দফায় তিন চারশ' করে পান।

একরাম উকিলের বাড়ি থেকে ফিরে মা রাতের রান্না নিয়ে বসলেন। বহুদিন পর বাড়িতে মাংশ রান্না হচ্ছে। নিতু পড়ার টেবিলে বসে মাংশের গন্ধ পাচ্ছিলো। পড়ার ফাঁকে তপুকে বললো, 'দাদা, এখন থেকে আমরা কি এ বাড়িতে থাকবো?'

'এটা আমাদের বাড়ি নাকি রে।' তপু হেসে বললো, 'ঢালকানগরের বাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত হয়তো এ বাড়িতে থাকতে পারি।'

'আমি জুয়েল ভাইয়াকে বলবো, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না।'

'বললেই হলো! দাদী কি বলেছেন শুনিসনি? এসব কথা বলতে হয় না।'

ঢালকানগরের বাড়িতে নিতুর জন্য কোনো আনন্দই ছিলো না। এ বাড়িটা ওটার চেয়ে অনেক বড়। এখানে থাকলে ভালো ভালো মাছ, মাংশ খাওয়া যায়। বাড়ির পেছনের গোটা তিনেক আম, কাঁঠাল গাছের ছায়াওয়ালা জায়গাটায় রান্নাবান্না খেলা যাবে। আমগাছের ডালে দড়ি বেঁধে দোল খাওয়া যাবে। এত আনন্দ ও বাড়িতে কোথায়? এ বাড়িটা তপুর নিজের ভালো লেগেছিলো। শুধু মা আর দাদী উদগ্রীব ছিলেন কখন নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবেন সেই চিন্তায়। মা বেশি চিন্তিত ছিলেন তপুর কথা ভেবে। জুয়েলের সঙ্গে মেলামেশা করলে ও যে গোল্লায় যাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

গভীর ষড়যন্ত্র

জুয়েল অনেক রাতে ঘরে ফিরেছিলো। সারা বাড়ি অন্ধকার, সামনের ঘরে টেবিল লাইটটা শুধু জ্বালানো ছিলো। তখন প্রায় দুটো বাজে। ওর জন্য টেবিলের ওপর রাতের খাবার ঢাকা দেয়া ছিলো। জুয়েল দেখলো, ভাত, মাংশের ঝোল, আলু পটল ভাজি আর ডাল। আটটার দিকে বারেকের বাড়িতে মোগলাই পরোটা খেয়েছিলো। তখন মনে হয়েছিলো রাতে না খেলেও চলবে। টেবিলের ওপর টলটলে ঝোলওয়ালা মাংশের বাটি দেখে ওর মনে হলো পেটে খিদে আছে। কোনো শব্দ না করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ও ভাত খেলো। মনে হলো বহুদিন এতো ভালো রান্না সে খায়নি।

সকালে ওর ঘুম ভাঙলো নিতুর ডাকে। রিনরিনে গলায় নিতু বলছিলো, 'জুয়েল ভাইয়া ওঠো। তোমার চা।'

নিতুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো জুয়েল। ওর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বললো, 'তুমি কি রোজ এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠো?'

'রোজ উঠি।' জুয়েলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিতুর ভারি আনন্দ হলো — 'দাদী বলেন আরও আগে উঠতে। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠলে নাকি মাথায় খুব বুদ্ধি হয়।'

নিতুর দিকে চোখ গোল করে তাকিয়ে জুয়েল বললো, 'তোমার মাথায় তাহলে অনেক বুদ্ধি আছে?'

'আমি তো ক্লাসে সব সময় ফার্স্ট হই।' বলে লাজুক হাসলো নিতু

'বাহ্, দারুণ তো! জানো, তোমার মতো আমার একটা ছোট্ট বোন আছে।'

'সত্যি! কোথায় থাকে ও?'

'আমাদের গ্রামের বাড়িতে। ঘুম থেকে রোজ দেরি করে ওঠে। একদম লেখাপড়া করতে চায় না।'

'কি করে ও?'

'সারাদিন গ্রামের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে। পাখির বাচ্চা ধরে, বড়শি দিয়ে মাছ ধরে, বিলে সাঁতার কেটে পদ্মফুল তোলে — আরও অনেক দুষ্টুমি করে। তুমি যাবে আমাদের গ্রামের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ যাবো। তুমি আমাদের নিয়ে যাবে?'

'শীতকাল আসুক। তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো।'

তপুর মা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিতুর সঙ্গে জুয়েলের কথা শুনছিলেন। তাঁর দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটা এমনভাবে কথা বলছে যেন ওর সমবয়সী। আর কী মনভোলানো হাসি! কে বলবে এই ছেলে মানুষ খুন করতে পারে! জুয়েলের মাস্তানির কথা মনে পড়তেই মা নিজেকে সামলে নিলেন। ঘরে ঢুকে কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'নিতু বুঝি চা দিতে এসে তোমাকে জ্বালিয়ে মারছে!'

জুয়েল উঠে বসে নিতুর দিকে তাকিয়ে হাসলো — 'না খালা! ওকে আমার বোনের গল্প বলছিলাম।'

মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিলো বাবা। তুমি বেরোবে কখন?'

নিতু চায়ের খালি কাপ নিয়ে চলে গেলো। জুয়েল বললো, 'আজ তেমন কোনো কাজ নেই। দশটা-এগারোটার দিকে একবার ইউনিভার্সিটি যাবো।'

একটু ইতস্তত করে মা বললেন, 'কাল একরাম উকিলের কাছে গিয়েছিলাম।'

'কি জন্যে?'

'নিজেদের বাড়িটা এভাবে বেদখল হয়ে গেলো। একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। তোমার বাড়িতে কদিন এভাবে থাকবো?'

জুয়েল আহত গলায় বললো, 'এ বাড়িতে আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে?'

'না না, আমাদের কষ্ট হবে কেন? কষ্ট তো তোমার হচ্ছে। বাড়িতে এতগুলো মানুষের বাড়তি উৎপাত! তোমাকে একরাম উকিল একবার দেখা করতে বলেছেন।'

গম্ভীর হয়ে জুয়েল বললো, 'তপু-নিতুর বয়সী আমার দুটো ছোট ভাইবোন আছে। আপনারা এ বাড়িতে থাকলে আমার ভালো লাগবে। তবে আমার সম্পর্কে অনেক আজে বাজে কথা শুনবেন। যদি আমার মতো খারাপ মানুষের বাড়িতে থাকতে আপনাদের অসুবিধে হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।'

'ওসব কিছু না বাবা।' শুকনো মুখে মা বললেন, 'যদি পারো আজ সকালে একবার একরাম উকিলের সঙ্গে দেখা করো।'

'ঠিক আছে, বলছেন যখন দেখা করবো।' জুয়েল বাথরুমে যাওয়ার জন্য তোয়ালে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো — 'তবে একরাম উকিল যত কথাই বলুক, এসব ক্ষেত্রে মামলা করে কোনো লাভ হবে না খালা। এ মামলা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে। হাজার হাজার টাকা খরচ হবে, তারপরও জিতবেন কিনা সন্দেহ আছে।'

'তুমি তাহলে কি করতে বলো?'

'জোর খাটাতে হবে। আজকের দুনিয়ায় যার জোর বেশি সেই রাজত্ব করবে।'

'আজ যদি জোর খাটিয়ে ও বাড়ির দখল আমাদের নিয়েও দাও, দুদিন বাদে ওরা

আবার গুণ্ডা পাঠিয়ে অপমান করবে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'সেরকম যাতে কখনও করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিভাবে করবে?'

'মন্ত্রী ধরতে হবে। যে দখল নিয়েছে সে দু নম্বরি কারবার করেছে। কড়া ধমক লাগাতে হবে। না মানলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

জুয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মা স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইলেন। কাল রাতে তিনি ভেবেছিলেন, কোনো অবস্থায় জুয়েলের বাড়িতে বেশি দিন থাকা যাবে না। তপু ওর পাল্লায় পড়লে নির্ঘাত বখে যাবে। তিনি ভেবেছেন, দু' এক মাসের ভেতর আদালতের রায় পেয়ে যাবেন। তারপর নিজেদের বরাদ্দ করা বাড়িতে উঠে যাবেন। জুয়েলের কথা শুনে তাঁর সব হিসেব গণ্ডগোল হয়ে গেলো। বছরের পর বছর মামলা চলা মানে ততদিন এখানে থাকতে হবে? মামলার খরচই বা কোথায় পাবেন তিনি? যদি তা না হয় জুয়েল যা ইঙ্গিত করলো তাঁকে তাই মেনে নিতে হবে? তাঁর জন্য আবার খুন করবে? আর কি কোনো পথ সামনে খোলা নেই? তাঁর বিয়ের পরের বছর তপু-নিতুর বয়সী দুটো ছেলেমেয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিলো। নাকি ওদের বাপকে পাকিস্তানী সৈন্যরা মেরে ফেলেছে, মাকে ধরে নিয়ে গেছে। তপুর বাবা মারা যাওয়ার পর একথা অনেক সময় তাঁর মনে হয়েছে, যদি এ বাড়িটা না থাকতো, খোদা না করুক, তাঁর যদি কিছু হয় — তপু-নিতু কি করবে? ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা কি তিনি করে যেতে পেরেছেন? গত দু' বছর ধরে যখের ধনের মতো বাড়িটাকে আগলে ছিলেন। যখনই শুনেছেন কোনো শহীদের পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তখনই তাঁর বুক কেঁপে উঠেছে। পরশু সন্ধ্যেবেলা তাঁর নিজের সাজানো আঠারো বছরের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলেন ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে তিনি বিষ খেয়ে মরবেন।

মাকে জুয়েলের ঘরে এভাবে বসে থাকতে দেখে দাদী অবাক হলেন। কাছে এসে বললেন, 'কি হয়েছে বৌমা? জুয়েল কি বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা বলেছে?'

'না মা!' শুকনো মুখে মা উঠে দাঁড়ালেন — 'ভাবছি, মামলা যে করবো কতদিনে রায় হবে কে জানে! আর এত টাকাই বা পাবো কোথায়?'

'কাল যে বললে একরাম উকিল জুয়েলকে দেখা করতে বলেছে? নিশ্চয়ই ও কিছু একটা ভেবেছে।'

'একরাম উকিল বলেছে জুয়েলের সঙ্গে মন্ত্রীদের যোগাযোগ আছে। জুয়েল বললো, মন্ত্রী দিয়ে কাজ না হলে খুন খারাপির মধ্যে যাবে।'

'বলো কি বৌমা! না, না, মানা করো ওকে। বস্তিতে ছাপরার ঘরে থাকবো, একবেলা উপোষ দেবো, ওসব কথা বললে এক্ষুণি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।'

মা চিন্তিত মুখে নাশতা বানাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকলেন। দাদী ঘুম থেকে উঠেই সেলাই নিয়ে বসেছিলেন। এখনও পাঁচটা কামিজের বর্ডারে হেম সেলাই বাকি রয়েছে। বারোটায় রহমত খলিফা আসবে এগুলো নেয়ার জন্য। তপুর মা'র কথা শোনার পর থেকে দাদী সেলাইয়ে মন বসাতে পারছিলেন না।

একরাম উকিল জুয়েলকে বলেছিলো, যে লোকটা তপুদের বাড়ির দখল নিয়েছে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য। সরকারী দলের কেউ হলে মন্ত্রীকে দিয়ে বলালেই হয়ে যাবে। এখনও খবরের কাগজওয়ালারা ঘটনাটা জানতে পারেনি। জানলে এ নিয়ে কাগজে লেখালেখি হবে। এমনিতে নির্মূল কমিটিওয়ালারা বলছে, সরকার নাকি জামাতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এ সময় শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে বাড়ি থেকে উৎখাত করার খবর কাগজে বেরোলে সরকারের জন্য সেটা ভালো হবে না।

একরাম উকিলের কথামতো জুয়েল কালা রশিদের গ্রুপকে লাগিয়েছে তপুদের বাড়ি কে কিনেছে তাঁর সব খবর আনার জন্য। সেই রাতেই ও মন্ত্রী মোবিনউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছে। মন্ত্রী অবশ্য প্রথমে ওকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন — 'তুমি এসবের মধ্যে নাক গলাচ্ছো কেন? কার বাড়ি কে নিচ্ছে তাতে তোমার কী? বেআইনী কিছু হলে থানা পুলিশ আছে, কোর্ট আছে। তোমার নিজের কিছু লাগলে বলো, ব্যবস্থা করে দিই।'

মন্ত্রীকে জুয়েল একরাম উকিলের যুক্তিগুলো দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শেষে বলেছে, আগের বাড়ি দেয়া সম্ভব না হলে শহীদ পরিবার হিসেবে ওদের যেন অন্য কোনো বাড়ি দেয়া হয়। সব শুনে মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, আমি পূর্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। বাড়ি বরাদ্দের ব্যাপারটা আমার হাতে না।'

কালা রশিদের গ্রুপ খবর জোগড় করতে গিয়ে ছয় দিন সময় লাগালো। তবে পাকা খবরই এনেছে ওরা। মালিকের নাম, পেশা, বাপের নাম, আদি বাড়ি, পারিবারিক ইতিহাস — কিছুই বাদ দেয়নি। এ ছাড়াও অনেক খবর আছে। লোকটার পরিচয় জানতে পেরে জুয়েল মনে মনে ভাবলো, কাজটা একদিক অনেক কঠিন হলেও অন্য দিক থেকে ওর জন্য সহজ হয়ে গেছে। তপুর মা সেদিন রাতে ওকে বলেছিলেন কোনো অবস্থায় ও যেন খুনখারাপির কথা না ভাবে। এখন তিনি কি বলবেন?

সেদিন ও রাত নটায় বাড়ি ফিরলো। দরজার ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো ছিলো। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও নিতুর ক্লাসের পড়া শুনতে পেলো। কচি গলায় নিতু চেঁচিয়ে পড়ছিলো — 'দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের শহীদ বলা হয়। দেশের জন্য যাঁরা — দাদী, আমাদের ছোট চাচা শহীদ না?'

ভেতরের ঘর থেকে দাদী কি বললেন জুয়েল শুনতে পেলো না। দরজা ধাক্কা দিয়ে তপুকে ডাকলো — 'তপু, দরজা খোলো।'

ব্যস্ত পায়ে তপু এসে দরজা খুলে দিলো। একটু হেসে বললো, 'আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরেছেন যে?'

জুয়েল ঘরে ঢুকে খাটে বসে জুতো খুলতে খুলতে বললো, 'কাজ না থাকলে আমি তাড়াতাড়িই ফিরি। তুমি তোমার মাকে আর দাদীকে একটু আসতে বলো, কথা আছে।'

জুয়েলের কথা শুনে তপু ঘাবড়ে গেলো। মাদের ডেকে কি বাড়ি ছেড়ে দিতে বলবেন? ভেতরের ঘরে মা আর দাদী বসে সেলাই করছিলেন। তপু শুকনো মুখে এসে বললো, 'জুয়েল ভাইয়া তোমাদের দুজনকে ডেকেছেন। কী নাকি কথা আছে।'

মা আর দাদী চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাঁরাও ভয় পেলেন — জুয়েল কোনো খারাপ খবর আনেনি তো! নিতু ছাড়া তপু, মা, দাদী সবাই এ বাড়িতে ওঠার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে আছেন — কখন তাঁদের চলে যেতে বলে কে জানে! যদিও জুয়েল মা আর দাদীকে বলেছে যতদিন খুশি তাঁরা এ বাড়িতে থাকতে পারেন — ওর মতো একটা মাস্তানের কথার কি কোনো দাম আছে? ঝোঁকের মাথায় থাকতে দিয়েছে, আবার কোন্ ঝোঁক উঠবে — বলবে, 'আপনারা বিদায় হন!'

মা আর দাদী চিন্তিত মুখে জুয়েলের ঘরে ঢুকলেন। ওঁদের বসতে বলে জুয়েল দু'জনকে দেখলো। দুজনের মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। ও বললো, 'ও বাড়ি থেকে আপনাদের যে লোকটা উচ্ছেদ করেছে তার সম্পর্কে সব খবর জেনেছি।'

দাদী শুকনো গলায় বললেন,' সেই বেজন্মার খবরে আমাদের কী লাভ!'

'জানা দরকার আছে।' গম্ভীর মুখে জুয়েল দাদীকে বললো, 'আপনার এক ছেলে তো যুদ্ধে মারা গেছেন। কিভাবে মারা গেছেন সব কথা আগে আমার শোনা দরকার।'

'মুরাদের সঙ্গে যারা ছিলো তাদের মুখে শুনেছি।' দাদী বললেন, 'আমাদের পাশের থানার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম রসুলকে আমার ছেলেরা মেরেছিলো। গোলাম রসুল জামাতের নেতা ছিলো। ওর অত্যাচারে শ্রীপুর, লৌহজং থেকে শুরু করে আশেপাশের সব জায়গার মানুষের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো। পাকিস্তানী সৈন্যদের ডেকে এনে শ্রীপুর বাজার লুঠ করালো। দোকানে আগুন লাগালো। জ্যান্ত মানুষজনকে পুড়িয়ে মারলো। বাড়ির মেয়েদের ধরে ধরে পাকিস্তানীদের ক্যাম্পে দিয়ে আসতো। তার ভয়ে এ এলাকার যত হিন্দু ছিলো সবাই বাড়িঘর ফেলে এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। গ্রামে তখন কোনো জোয়ান ছেলে ছিলো না, হয় যুদ্ধে গেছে না হয় ইণ্ডিয়া গেছে। সেই হারামজাদাকে আমার মুরাদের দলের ছেলেরা যখন মারলো, ঘরে ঘরে সবাই নফল নামাজ পড়ে ওদের জন্য দোয়া করেছিলো। কে জানতো মুরাদের মরণের কারণও হবে সে!' কথা বলতে বলতে দাদীর গলা ধরে এলো, চোখের কোণ ভিজে গেলো। আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'গোলাম রসুলকে খতম করার এক মাস পর মুরাদরা এসেছিলো পাকিস্তানীদের ক্যাম্পে হামলা করার জন্য। রাতে তারা ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়ে এসে লৌহজং স্কুলে শেল্টার নিয়েছিলো, কি করে যেন গোলাম রসুলের ভাই গোলাম আব্বাস খবর পেয়েছিলো। সেই রাতেই ও ঢাকায় টেলিফোন করে খবর দেয়। ভোর হওয়ার আগে পাকিস্তানী সৈন্যরা স্কুল ঘিরে ফেলে। মুরাদরা ছিলো মাত্র পাঁচজন, পাকিস্তানীরা এক শ'র বেশি। সঙ্গে রাজকারও ছিলো। তারপরও মুরাদরা যুদ্ধ করেছে। দুটো রাজাকার আর আঠারোটা পাকিস্তানী সৈন্যকে মেরে তারপর ওরা মরেছে। মুরাদের বন্ধুরা এসব কথা শুনেছে গ্রামের লোকদের কাছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ওদের লাশগুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে।' কথা শেষ করে দাদী কোনো রকম শব্দ না করে কাঁদছিলেন।

জুয়েল কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। পাকিস্তানী সৈন্য আর তাদের এ দেশী দালালদের অত্যাচারের কথা গত মাসে জাহানারা ইমামের জনসভায় কিছু শুনেছিলো। জনসভার কথা ওর পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। তপুর দাদীর কথায় কিছুটা আঁচ করতে

পারলো একাত্তরে কি ঘটেছিলো। বললো, 'গোলাম আব্বাস এখন কোথায় জানেন?'

'দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই ও পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলো। শেখ মুজিবকে মারার পর আবার দেশে ফিরেছে। শুনেছি, ব্যবসাপাতি করে অনেক টাকা বানিয়েছে।'

'গোলাম রসুলের ছেলেদের সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না বাছা! দুই ছেলে ছিলো। যুদ্ধের আগেই ওদের লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলো লেখাপড়ার জন্য। পরে ওরা ফিরেছে কিনা জানি না।'

'ফিরেছে। একটার নাম গোলাম কবীর। তপুর বাবা যে জুবিলী প্রেসে কাজ করতেন সেটার মালিক সে।'

জুয়েলের কথা শুনে তপুর মা চমকে উঠলেন — 'সে কী! তপুর বাবা তো কোনো দিন এ কথা বলেন নি?'

'তিনি বোধহয় জানতেন না।'

দাদী বললেন, 'পরিচয় না জানলেও নতুন মালিক যে জামাতের লোক এ কথা তপুর বাবা কয়েকবারই বলেছে।'

'আপনাদের ঢালকানগরের বাড়িও এই গোলাম কবীরই কিনেছে।'

জুয়েলের কথায় যেন ঘরের ভেতর বাজ পড়লো। মা আর দাদী এমনই চমকালেন যে, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। জুয়েল বললো, 'আপনারা জানেন, তপুর বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। সব কথা জানার পর আমার মনে হচ্ছে, তাঁকে গোলাম কবীর খুন করেছে।'

দাদী ভাঙা গলায় বললেন, 'আমরা গরিব দুঃখি মানুষ। হারামজাদা আমাদের পেছনে লাগলো কেন? এইটুকুন একটা বাড়ি দিয়ে ও কী করবে?'

'কিছুই করবে না। ওর বাপকে যারা মেরেছে তাদের নাম-নিশানা রাখবে না ও।'

দাদী কান্নায় ভেঙে পড়লেন — 'আমার মুরাদকে মেরে ওদের শান্তি হয়নি? এত বছর পর মোমেনকে খুন করলো? আমাদের বেঘর করলো?'

'শুধু বেঘর করে থামে কিনা দেখুন। এরপর হয়তো তপুর ওপর আঘাত আসবে। আপনার ছেলের সঙ্গে যারা ছিলো তাদের কারও পরিবারকে ও রেহাই দেবে না।'

'তুমি এত কথা কোত্থেকে জানলে বাবা!'

জুয়েল তপুর মার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো — 'কালা রশিদের কাছে আপনি শুনেছেন আমি মাস্তানি করি, মানুষ খুন করি। সেরকম মাস্তানি করতে হলে খবর বের করার অনেক ফন্দি ফিকির জানতে হয়। তপুর চাচা গোলাম রসুলকে মেরেছে বলে সবাই নফল নামাজ পড়ে তার জন্য দোয়া করেছে। সেই গোলাম রসুলের ছেলে তপুর বাবাকে মেরেছে, আপনাদের রাস্তায় নামিয়েছে, আপনাদের মতো আরও অনেককে খুন করবে, পথে বসাবে। আজ যদি আমি গোলাম কবীরকে খুন করি আপনারা আমাকে খুনী, মাস্তান বলে ঘেন্না করবেন?'

তপুর মার সঙ্গে কথা বলে কালা রশিদ সেদিন মোটেই খুশি হতে পারেনি। ওর ওস্তাদকে তারই আশ্রিত কেউ অশ্রদ্ধা করে কথা বলবে এটা ওর মনে খুব লেগেছিলো।

কথাটা জুয়েলকে কিছুটা রং চড়িয়েই ও বলেছিলো। শুনে জুয়েলেরও মন খারাপ হয়েছে। আজ তপুর মাকে কথাগুলো বলতে পেরে নিজেকে হালকা মনে হলো।

জুয়েলের কথা শুনে তপুর মা মাথা নিচু করে বসে রইলেন। দাদী হাউমাউ করে কেঁদে জুয়েলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার দুই ছেলে গেছে। তুই আমার ছেলের চেয়েও বেশি। আমার ছেলের খুনী যদি তোর হাতে মারা পড়ে আমি জীবনভর তোর জন্য দোয়া করবো।'

তপুর মাও কাঁদছিলেন, দাদীর কথা শুনে তিনি চোখের পানি মুছে বললেন, 'এসব আপনি কী বলছেন মা! জুয়েলের মা-বাবা আছে। ভবিষ্যৎ আছে। আপনি কি চান গোলাম কবীরকে খুন করে ও ফাঁসিতে ঝুলুক?'

দাদীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জুয়েল বললো, 'আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ক্ষমতা কারও নেই।'

মা বললেন, 'ফাঁসির কথা বাদ দিলেও গোলাম কবীরদের দলকে ছোট করে দেখো না। সারা দেশে ওরা কিভাবে ছাত্রদের গুলি করে মারছে, হাত-পায়ের রগ কেটে দিচ্ছে, এসব খবর কি তুমি জানো না?'

'জানি খালা! তারপরও আমি যদি ঠিক করি গোলাম কবীর আমার হাতে মরবে, কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না। যদি মরি, ওকে মেরে তারপর মরব। মরণকে ভয় করে বেঁচে থাকা যায় না। মরণের ভয় থাকলে তপুর বাবা, চাচারা যুদ্ধ যেতে পারতো না।'

'এটা একাত্তর সাল নয় জুয়েল! যুদ্ধে অনেক কিছুই করা যায়। এখন দেশে আইন আছে। গোলাম কবীরকে মেরে তুমি আমাদের উপকার করলেও আইনের চোখে খুনী হয়ে যাবে।'

'আইনের কথা আমাকে বলবেন না খালা। আইন তপুর বাবাকে বাঁচাতে পারেনি। আইনের কাগজ থাকা সত্ত্বেও আপনাদের যখন রাস্তায় নামিয়েছে, আইন কিছু করতে পারেনি। এদেশের আইন গোলাম কবীরদের রক্ষা করার জন্য। আইনের চেয়ে এদেশে মন্ত্রী বড়। সরকার বড়। মন্ত্রীরা আমাদের তোয়াজ করে কথা বলেন। আইন আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি কী করবো না করবো সেটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

জুয়েলের কথা শুনে মা আর দাদী দুজন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বড়দের কথা শোনা উচিৎ নয় জেনেও জুয়েলের কথা শুনে তপু যেরকম ঘাবড়ে গিয়েছিলো, নিজেকে সে পড়ার টেবিলে আটকে রাখতে পারেনি। টেরও পায়নি কখন সে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় জুয়েল। মা তাকে কেন বাধা দিচ্ছেন ভেবে কূল-কিনারা পেলো না। জুয়েল সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা শুনেছ ও। সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো, জুয়েল পুরোনো ঢাকার নামকরা খুনী মস্তান নয়। স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবদূত।

অন্যরকম জুয়েল

জুয়েলের বাড়িতে তপুদের আশ্রয় নেয়াকে অনেকেই ভালো নজরে দেখেনি। মে মাসের আঠারো তারিখে জাহানারা ইমামদের জাতীয় সমন্বয় কমিটি হরতাল ডেকেছে। হরতালের জন্য কী করতে হবে তপু গিয়েছিলো ওদের থানা কমিটির নেতা আবদুস সামাদের কাছে জানতে। অন্য দিন তপুর সঙ্গে যেরকম আগ্রহ নিয়ে কথা বলে সবাই, সেদিন ও লক্ষ্য করলো, ওকে কেমন যেন এড়িয়ে চলছে। তপু নিজেই জিজ্ঞেস করলো, 'হরতালের জন্য কি কিছু করতে হবে সামাদ ভাই?'

'তুমি আর কী করবে?' সামাদ ওর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলো।

'না, জানতে চাইছিলাম কিছু যদি করার থাকে।'

তপুর কথার জবাব না দিয়ে সামাদ অন্য কর্মীদের বললো, 'চন্দন, হানিফ, কেরামত বসে ঠিক করে ফেলো তোমাদের গ্রুপে কারা থাকবে! দু দিনের ভেতর চিকা মারার কাজ শেষ করতে হবে। এরপর মাইকিং-এর কাজ রয়েছে।'

অন্যরা সবাই কাজের কথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এর ভেতর মুড়ি আর পেয়াজু আনা হলো । টেবিলে খবরের কাগজ বিছিয়ে সবাই হুড়োহুড়ি করে খেলো। তপু ঘরের এক কোণে বেঞ্চে বসেছিলো। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এখানে এসেছে। তার খিদে থাকা সত্ত্বেও কেউ ওকে খেতে ডাকলো না।

চন্দনরা তাদের দল নিয়ে অফিস থেকে চলে যাওয়ার পর সামাদ তপুকে জিজ্ঞেস করলো — 'তোমরা থাকার জন্য কি আর কোনো জায়গা পাওনি? বিএনপি-র একটা গুণ্ডার বাড়িতে কী মনে করে উঠেছো?'

তপু সামাদের কথা বলার ধরনে খুবই আহত বোধ করলো। বললো, 'আমাদের যেদিন জামাতীদের গুণ্ডারা এসে বাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিলো, সেদিন পাড়ার অনেকে ছিলেন। কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে চাননি। জুয়েল ভাই আশ্রয় না

দিলে আমাদের না খেয়ে মরতে হতো!

'বাজে কথা বলবে না। তুমি আমাদের কেন জানাওনি?'

'আপনারা সেদিন সম্মেলনে ব্যস্ত ছিলেন।'

'পরে তো এসে বলতে পারতে!'

'তা পারতাম। কিন্তু সেই রাতে কোথায় থাকতাম? আমার একটা ছোট বোন, মা, বুড়ো অসুস্থ দাদীকে নিয়ে কি রাস্তায় বসে রাত কাটাতাম?'

'তোমরা কি ভেবেছো, জুয়েল তোমাদের বিনা মতলবে থাকতে দিয়েছে?'

'তার আবার মতলব কি?'

'ও তোমাকে দিয়ে আমাদের ভেতরের সব গোপন খবর বের করবে। তারপর গিয়ে বিএনপি আর জামাতীদের কাছে ওসব খবর বেচবে।'

'এ কদিনে তিনি একবারও আমাদের কোনো ব্যাপারে কিছু জানতে চাননি।'

'চাইবে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। আগে খাইয়ে দাইয়ে তোমাদের ভালোভাবে পোষ মানাবে। তারপর ঠিকই খবর জানতে চাইবে। তুমি বোধহয় জানো না, ওকে বিএনপি আর জামাতীরা আমাদের দুটো মিটিঙ ভাঙার জন্য ভাড়া করেছিলো?'

'আমার বিশ্বাস হয় না। জুয়েল ভাই ওরকম মানুষ নয়।'

'জুয়েলকে তুমি কি আমার চেয়ে বেশি চেনো? ওর সব খবর আমি জানি।'

তপু কি বলবে ভেবে পেলো না। সেদিন যদি মা আর দাদীর সঙ্গে জুয়েলের কথাগুলো না শুনতো, তাহলে হয়তো সামাদের কথা বিশ্বাস করতে পারতো! যে জুয়েল ওর মুক্তিযোদ্ধা বাবার হত্যাকারীকে খুন করবে বলতে পারে তাকে এতটা অবিশ্বাস ও কিভাবে করবে?

তপুকে চুপ থাকতে দেখে সামাদ আবার বললো, 'জুয়েল গত বছর আমাদের দুটো ছেলেকে খুন করেছে — এ কথাটা তোমার জেনে রাখা দরকার।'

'কেন খুন করেছে?'

'মানুষ খুন করা ওর পেশা।' চিবিয়ে চিবিয়ে সামাদ বললো, 'টাকার জন্য ও যে কাউকে খুন করতে পারে।'

জুয়েল মানুষ খুন করেছে — এ কথা ও মন্টুর কাছেও শুনছে। কিন্তু ও পেশাদার খুনী এটা তপু মানতে পারলো না। কারণ গোলাম কবীরকে খুন করার জন্য জুয়েলকে কেউ টাকা দেবে না বরং ওর নিজের জীবন বিপণ্ন হবে। পেশাদার কেউ এত ঝুঁকির কাজ করতে চাইবে না।

'তোমার বয়স কম। অনেক জিনিসই তুমি ঠিকমতো বুঝবে না।' সামাদ শান্ত গলায় তপুকে বললো, 'নিজেদের ভালো যদি চাও, যত তাড়াতাড়ি পারো জুয়েলের বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। ও তোমাকে কিভাবে ব্যবহার করবে — তুমি টেরও পাবে না।'

রাতে তপু সরাসরি জুয়েলকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি গত বছর সামাদ ভাইদের দুটো ছেলেকে খুন করেছেন?'

'কোন্ সামাদ?' জুয়েল হঠাৎ করে চিনতে পারলো না।

'ছাত্রলীগের আবদুস সামাদ। সূত্রাপুরে থাকেন।'

'ও হ্যাঁ, বুঝেছি। কার কাছে শুনলে?'

'সামাদ ভাই বলেছেন। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। কেন খুন করেছি জানতে চাও?'

'কেন করেছেন?'

'ছেলে দুটো আগে এরশাদের দল করতো। খুনখারাপি থেকে শুরু করে এমন কোনো নোংরা কাজ নেই যা ওরা করেনি। একবার দুটো কলেজের মেয়ের সর্বনাশ করতে গিয়েছিলো। ওর ভেতর একটা মেয়ে ছিলো আমার বন্ধু কালা রশিদের বোন। আমি বাধা দিয়েছিলাম। ওরা তখন পিছু হটে গিয়েছিলো। হুমকি দিয়েছিলো আমাকে নাকি দেখে নেবে। এরশাদ জেলে যাওয়ার পর ওরা ছাত্রলীগে ঢুকে পড়ে আমাকে খুন করার প্ল্যান করে। আমি ওদের না মারলে ওরা আমাকে মারতো। আমার হাতে যারা মরেছে তাদের কারও রেকর্ড আমার চেয়ে ভালো নয়। আমি আর যাই করি কখনও কোনো নিরীহ মানুষের ওপর জুলুম করিনি, মেয়েদের অসম্মান করিনি।'

তপুকে কথাগুলো বলে জুয়েল নিজেকে হালকা বোধ করলো। কাউকে খুন করার কথা ওকে বলা হলে ওর নাড়ি-নক্ষত্র সব কিছু আগে জেনে নেয়। তপুকে ও মিথ্যা বলেনি। ও যে কটা খুন করেছে সবাই দাগী আসামী। ওদের খুন করার জন্য কেউ ওর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেনি। সরকারি দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে বলে পুলিশও এ নিয়ে কখনও বিরক্ত করেনি। এরশাদের পতনের পর সূত্রাপুর থানার ওসি শুধু বলেছিলেন ওর পিস্তলটার জন্য একটা লাইসেন্স করিয়ে নিতে। এর জন্য ওকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। আবদুল বারেকই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

বারেকের সঙ্গে জুয়েলের সম্পর্কটা ইদানিং ভালো যাচ্ছে না। মন্ত্রী মোবিনউদ্দিন অবশ্য দুজনকে নিজের বাড়িতে ডেকে মিষ্টি খাইয়ে বলেছেন তারা যেন নিজেদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য না রাখে। বহু বছর পর পার্টি মাত্র ক্ষমতায় এসেছে। সামনে কত কাজ! এ সময় নিজেদের মধ্যে কোনো ভুলবোঝাবুঝি থাকলে তাতে শত্রুদেরই লাভ। শত্রু কি তাদের কম! আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি তো আছেই, হালে আবার গজিয়েছে নির্মূল কমিটি। এদের মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হলে নিজেদের ভেতর কোনো ঝুট-ঝামেলা রাখা চলবে না।

আবদুল বারেকও তা স্বীকার করে। জুয়েল সেদিনের ছেলে। রাজনীতি কিছুই বোঝে না। গায়ে জোর আছে, বুকে সাহস আছে, সবাই ওকে ভয় পায়, দলের একটা এ্যাসেট — সবই ঠিক আছে। তবে কিছুদিন থেকে বারেক এটা লক্ষ্য করেছে, জুয়েল ভেতরে একটু বদলে যাচ্ছে। হতে পারে মোবিনউদ্দিন একটু বেশি লাই দিচ্ছেন বলে এখন ও বারেককে আগের মতো পাত্তা দিতে চায় না। সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছে গোলাম কবীরের সঙ্গে ওর আচরণে।

গোলাম কবীর জামাতের প্রকাশ্য সংগঠনের কেউ নয়, তাদের গোপন শাখার

একজন বড় নেতা। এটা বারেক আগে থেকেই জানতো। পুরোনো ঢাকায় ওর মোটর ওয়ার্কশপ আছে, প্রেস আছে, ঘড়ির দোকান আছে, বাড়ি আছে গোটা পাঁচেক। সেই সঙ্গে মিড্‌ল ইস্ট-এ আদমের ব্যবসা। এ ধরনের লোকের সঙ্গে নিজের স্বার্থে যেমন, দলের স্বার্থেও সম্পর্ক ভালো রাখতে হয়। গোলাম কবীর জানে, জুয়েল হচ্ছে বারেকের পোষা গুণ্ডা। বারেককে নিজের ইণ্ডেন্টিং ফার্মের অফিসে ডেকে নিয়ে ঠাণ্ডা কোক খাইয়ে বলেছে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোমেনের পরিবারকে জুয়েল আশ্রয় দেয়াতে কেন সে অসন্তুষ্ট। সব কথা শুনে বারেকেরও মনে হয়েছে গোলাম কবীর ঠিকই বলেছে। নিজের বাপের খুনীদের সুযোগ পেলে কে না নিকেশ করতে চাইবে! মুক্তিযুদ্ধ করেছে বলে কারও সাত খুন মাপ হতে পারে না। বিশেষ করে গোলাম কবীরের কাছে যেখানে ডেফিনিট প্রমাণ আছে আবদুল মোমেনের ক্লাস টেন-এ পড়া পুঁচকে ছেলেটা পর্যন্ত নির্মূল কমিটি করে। আর ওদের বাড়ি তো আসল মালিকের কাছ থেকে গোলাম কবীরের বাবা সত্তর সালেই কিনেছিলো। কয়েক বছর দেশের বাইরে ছিলো বলে তো সরকার ওটা নিতে পারে না। কোর্টের রায়ে তাই বলা হয়েছে।

গোলাম কবীরের সব কথায় একমত হয়ে সেদিনই জুয়েলকে ডেকে পাঠিয়েছিলো বারেক। জুয়েল এলো তিনদিন পর। ওর ওপর বারেকের রাগের এটাও একটা কারণ, ডাকা মাত্র আসে না। তারপরও রাগ না দেখিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ও গোলাম কবীরের যুক্তিগুলো জুয়েলকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। হাই কমাণ্ডের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, জামাতের সঙ্গে কোনো রকম বিরোধে যাওয়া চলবে না। জামাতের সমর্থন না পেলে বিএনপি-র পক্ষে সরকার চালানো সম্ভব নয়।

রাজনীতির এতসব মারপ্যাঁচের ধারে কাছে গেলো না জুয়েল। সোজাসুজি জানতে চাইলো, 'আপনে কি কইবার চান পষ্ট কইরা কন বারেক ভাই।'

'আমি কইবার চাই, ওই মুক্তিযুদ্দার গুষ্টিরে তুমি বাড়িত থেইকা বাইর কইরা দিবা।' স্পষ্টভাবেই কথাটা বললো বারেক।

'কার কতায় বাইর করুম?'

'গোলাম কবীরের কতায়।'

'আপনের গোলাম কবীরের মুখে আমি মুতি।' এই বলে বারেকের ঘর থেক রেগেমেগে বেরিয়ে এসেছিলো জুয়েল। বারেক যদি আওয়ামী লীগের কোনো মাস্তানকে শায়েস্তা করতে বলতো কিংবা যদি বলতো জাতীয় পার্টির মিটিঙ ভেঙে দিতে হবে অথবা ম্যাডামের মিটিঙে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে, জুয়েল দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করতো না। গোলাম কবীরের মতো একটা ক্রিমিনালের কথায় অসহায় গরিব কটা মানুষের ওপর জুলুম করতে হবে এটা সে কখনও পারবে না।

কদিন ধরে জুয়েল লক্ষ্য করেছে, তপু আর নিতুর জামা কাপড়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়। মা, দাদী ভালো সেলাই জানেন বলে এমনভাবে ছেঁড়া ঢেকে দেন যে, চট করে চোখে পড়ে না। তাঁদের নিজেদের কাপড়েও কি সেলাই কম পড়েছে? বারেকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জুয়েল বঙ্গবাজার থেকে মা আর দাদীর জন্য দু'খানা করে শাড়ি কিনলো, যেমনটা তাঁরা পরেন। নিতুর জন্য দুটো ফ্রক কিনলো। একটা হালকা নীল

জিনস্-এর, আরেকটা ঘিয়ে রঙের কড-এর। তপুর জন্য দুটো প্যান্ট আর শার্ট। তপুর দুটো প্যান্টই দু রঙের জিনস্-এর। সব মিলিয়ে ষোল শ' টাকা খরচ হলো। ওর মনে হলো বুঝি নিজের ভাই-বোন আর মা-বাবার জন্য এসব কিনেছে। ঠিক করলো, একদিন তপু আর নিতুকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। বারেকের কথা শুনে ওর যে রাগ হয়েছিলো এভাবেই সেটা দূর হলো।

এত সব কাপড় জামা নিয়ে বাড়ি ফেরার পর তপুর মা আর দাদী ওকে খুব বকলেন — 'এভাবে এতগুলো টাকা নষ্ট করার কি দরকার ছিলো!' 'টাকা কি ওর বেশি হয়ে গেছে।' — এসব কথা বলে।

জুয়েল ওর ভুবনভোলানো হাসির সঙ্গে বললো, 'কদিন পরই তো ঈদ। আমার বুঝি ভাইবোনদের নিয়ে আনন্দ করতে ইচ্ছে হয় না!'

'গ্রামের বাড়িতে যে তোমার দুটি ভাইবোন আছে, মা-বাবা আছেন তাঁদের কথা কি মনে আছে?'

'খুব আছে। পরশু বাড়িতে লোক যাবে। ঈদের বাজার ওর হাতে পাঠিয়ে দেবো।'

'ঈদে তুমি বাড়ি যাও না?'

'জরুরি কাজ না থাকলে ঈদের দিন সকালে যাই, পরদিন চলে আসি। এবার যদি যাই তপু-নিতুকে নিয়ে যাবো।'

মা আর দাদী আর কী বলবেন। জুয়েলকে মনে হলো আসমান থেকে নেমে আসা ফেরেশতা বুঝি!

গোলাম কবীরকে অপমান করতে গিয়ে জুয়েল যে আসলে আবদুল বারেককেই অপমান করেছে কথাটা যতবার মনে হচ্ছিলো ততবারই বারেকের গায়ে হুল ফুটছিলো। প্রথম সুযোগেই সে মন্ত্রী মোবিনউদ্দিনকে পুরো ঘটনাটা জানালো। কথা শেষ করলো এই বলে — 'কাইলকার পোলা জুয়েল। বয়স মানে না, আদব কায়দা জানে না, পলিটিস্ক বুঝে না। এই হগল উল্টাসিদা কারবার পার্টিতে চলবার দিলে ডিসিপ্লিন কইতে আর কিছু থাকবো না। দুই দিন বাদে ম্যাডামের নজরে পড়লে আপনের লগেও চোপা করবো। সময় থাকতে ওরে সামাল দেন।'

বারেক যে জুয়েলকে সহ্য করতে পারছে না এটা মোবিনউদ্দিনের অজানা নয়। বললেন, 'আপনাকে আগেও বলেছি, এসব মাথাগরম ছেলেদের হ্যাণ্ডেল করার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। ঠিক আছে, যান, এ নিয়ে আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

পরদিন মোবিনউদ্দিন জুয়েলকে ডেকে পাঠিয়ে বারেকের অভিযোগের কথা বললেন। জুয়েল রেগে গেলেও প্রকাশ করলো না। শান্ত গলায় বললো, 'মোবিন ভাই, ওদের আমি যদি আশ্রয় না দিতাম পরদিন খবরের কাগজে বেরুতো — সরকার গরিব অসহায় একটা শহীদ পরিবারকে বাড়িছাড়া করে রাস্তায় বের করে দিয়েছে।'

'সরকার কোথায় বাড়িছাড়া করলো! বাড়ির আসল মালিক নিজের বেহাত হওয়া বাড়ির দখল নিয়েছে। এতে সরকারের কী করার আছে?'

'ওই বাড়িটা সরকার একটা শহীদ পরিবারকে বরাদ্দ করেছিলো।'

'সরকার কি শুধু আমরা? ওটা আওয়ামী লীগ সরকার করেছিলো। ওরা যেসব

বেআইনী কাজ করেছে তার দায় আমরা কেন নিতে যাবো?'

'এখন তাহলে সরকারের উচিৎ হচ্ছে আইনীভাবে এদের জন্য থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়া।'

'তার তো নিয়ম আছে! তারা কল্যাণ ট্রাস্টে যায় না কেন?'

'কোথাও যাবার ক্ষমতা তাদের নেই। আমি মনে করি, ওদের আশ্রয় দেয়াতে এলাকায় আমাদের দলের সম্মান বেড়েছে। এ সুযোগ তো আওয়ামী লীগাররাও নিতে পারতো!'

'ঠিক আছে, তোমার যুক্তি মানলাম। কিন্তু এখানে জামাতের একজন জাঁদরেল নেতার স্বার্থ জড়িত — সেটাও তো ভাবতে হবে। এ মুহূর্তে আমরা জামাতকে ঘাঁটাতে চাই না।'

'আপনি জানেন না, গোলাম কবীর একটা ক্রিমিনাল। সে তপুর বাবাকে খুন করেছে। তাদের বাড়িছাড়া করেছে। এর পর সর্বনাশের আর বাকি থাকে কী?'

'এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। বারেক সাহেব বলেছেন নির্মূল কমিটির ছেলেকে তোমার ওখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না। তিনি তোমাদের থানার প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথা তোমার শোনা উচিৎ।'

'তার কথা সব সময়ই শুনি। এটা তার কথা নয়, গোলাম কবীরের কথা। একটা ক্রিমিনালের কথায় আমি অসহায় গরিব মানুষের ওপর জুলুম করতে পারবো না।'

'তুমি আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিলে।' একটু বিরক্ত হয়ে মোবিনউদ্দিন বললেন, 'ঠিক আছে যাও, আমি বারেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো।'

পরদিন আবদুল বারেক আসতেই ওকে জুয়েলের গোঁয়ার্তুমির কথা বললেন মোবিনউদ্দিন — 'এভাবে হবে না বারেক সাহেব, অন্য কোনো রাস্তা ভাবুন।'

মোবিনউদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করে জুয়েলের বেয়াড়াপনা সামাল দেয়ার জন্য, সেই সঙ্গে গোলাম কবীরদের সন্তুষ্ট করার জন্য ভয়ঙ্কর এক ফন্দি আঁটলো বারেক। এমনই ছিদ্রহীন পরিকল্পনা যে, নিজের বুদ্ধিতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

কয়েকদিন পার্টি অফিস থেকে জুয়েলের ডাক এলো না। বারেকের পরিকল্পনার এটাও একটা অংশ। মাছকে বড়শি দিয়ে টেনে তোলার আগে সূতোয় অনেকখানি ঢিল দিতে হয়। জুয়েল এসব ষড়যন্ত্রের কিছুই আঁচ করতে পারলো না। তপু-নিতুকে নিয়ে একদিন সিনেমা দেখলো, একদিন ওদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলো, জুতো কিনে দিলো, স্কুলের ব্যাগ কিনে দিলো, আর অবসর সময়ে ওর কবি বন্ধুর কাছ থেকে আনা বইগুলো পড়লো।

জহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ে কদিন ও ঘোরের ভেতর ছিলো। বার বার ওর মনে হচ্ছিলো, এখন যদি একাত্তরের মতো একটা যুদ্ধ হয় তাহলে ও দেখিয়ে দিতে পারতো ওর ক্ষমতা কতটুকু! 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' পড়ে ও কালা রশিদের সঙ্গে প্ল্যান করলো গোলাম কবীরকে কিভাবে গুমখুন করা যায় এ নিয়ে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েদের লেখা 'বাবার কথা' পড়ে ওর কান্না পেলো।

দিন পনেরো পর মন্ত্রী মোবিনউদ্দিনের বাড়িতে ওর ডাক পড়লো। ঘড়ি ধরে রাত সাড়ে দশটায় মন্ত্রীর খাস কামরায় গিয়ে দেখে, বারেকও রয়েছে সেখানে। মোবিনউদ্দিন খুব আন্তরিক গলায় বললেন, 'এসো জুয়েল, বসো।'

বারেকও দরদভরা গলায় বললো, 'রাইতে খাইছ কিছু, না আগে খায়া লইবা?'

জুয়েল একটু হেসে বললো, 'আমি খাইছি। আপনে না খাইলে খাইবার পারেন।'

'আমরা খেয়েছি। বারেক সাহেবের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খেলাম আজ।'

বারেকের মেয়ের বিয়ে হলো, জুয়েলরা কিছু জানলো না! ও একটু অবাক হলো। পরে মনে হলো, নেতাদের বাড়ির কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দলের মাস্তানদের কখনও ডাকা হয় না।

মন্ত্রী কথা শুরু করার আগে আর্দালীকে ডেকে ড্রিঙ্কস দিতে বললেন। তারপর ঠাণ্ডা কোকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'জুয়েল, তোমাকে দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে চাই।'

জুয়েল বললো, 'যদি মনে করেন আমি পারবো, তাহলে দিতে পারেন।'

'আগে জানা দরকার তোমাকে আমরা কতটুকু বিশ্বাস করতে পারি।'

'আমার কোনো কাজে কি অবিশ্বাস করার মতো কিছু দেখেছেন?'

'দলকে তুমি কতটুকু ভালোবাসো জুয়েল?'

'আমার কাজের ভেতর দিয়ে এতদিন কি দলের জন্য আমার ভালোবাসার পরিচয় দেই নি?'

মোবিনউদ্দিনের প্রশ্নের ধরনে জুয়েল কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলো। এমন কী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওকে দেয়া হবে যার জন্য এভাবে জেরা করা হচ্ছে? মন্ত্রী আগের মতো আবার ওকে প্রশ্ন করলেন, 'দলের জন্য জীবন দিতে পারো?'

'এমন অনেক কাজ দলের জন্য আমাকে করতে হয়েছে যেখানে মারা যাবার ঝুঁকি ছিলো।'

মৃদু হেসে মোবিনউদ্দিন বললেন, 'সবই জানি জুয়েল। এটা একটা রুটিন চেক আপ।' কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমাকে দলের ভেতরের রাজনীতি সম্পর্কে একটু বলতে চাই। বাইরে সবাই জানে জামাতের সঙ্গে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। আওয়ামী লীগ আর নির্মূলওয়ালারা তো বলে, গোপন আঁতাত আছে।'

'কথাটা কি মিথ্যে? কদিন আগে বারেক ভাই, বলেছেন, জামাতের সমর্থন ছাড়া বিএনপি সরকার চালাতে পারবে না।'

'এক দিক থেকে কথাটা মিথ্যে নয়। তবে জামাত এমন একটা দল যাদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। সুযোগ পেলেই তারা ছুরি মারবে।'

'আমিও তাই মনে করি!'

'আমাদের হাই কমাণ্ড মনে করে, জামাত ধীরে ধীরে আমাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠছে। ওরা আর্মির ভেতর ওদের অনেক লোক ঢুকিয়েছে। সরকারের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রে-

শনেও ওদের লোক কম নয়। আমাদের ইন্টালিজেন্সের খবর হচ্ছে, রোহিঙ্গাদের সাহায্য দেয়ার নাম করে ওরা বাইরে থেকে অনেক অস্ত্র এনেছে।'

'এরপরও আমরা ওদের কিছু বলবো না?'

'বলবো। তবে যেভাবে নির্মূলওয়ালারা বলে সেভাবে নয়।'

'কী ভাবে?'

'তুমি তে জানো, জাহানারা ইমাম গত ক মাসে জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলে, গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করে কি রকম পপুলার হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাঁর জনসভায় হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি লোক হচ্ছে।'

'আজ যদি জাহানারা ইমামকে জামাতীরা খুন করে, তার ফল কী হবে ভাবতে পারো?'

'সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠবে।'

'ঠিক বলেছো।'

'আপনি কি ঠিক জানেন জামাতীরা তাঁকে খুন করবে?'

'না, জামাতীরা তাকে খুন করবে না। খুন আমরা করবো, গোপনে। লোকে জানবে, জামাতীরা করেছে। সারা দেশ জামাতীদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। জাহানারা ইমামের নাম জামাতের টার্গেট লিস্টে আছে। ওদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া তখন আমাদের জন্য সহজ হবে।'

মোবিনউদ্দিনের কথা শুনে জুয়েল হতভম্ব হয়ে গেলো। জামাতকে এভাবে শায়েস্তা করার কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। ও ভেবেছে জামাতের কয়েকজন নেতাকে টার্গেট করার কথা বুঝি ওকে বলা হবে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে মোবিনউদ্দিন বললেন, 'কী জুয়েল, পারবে না?'

'আ – আমি?'

'তুমি ছাড়া দলে এতখানি সাহসী আর বিশ্বাসী আর কেউ নেই।' একটু থেমে মোবিনউদ্দিন আবার বললেন, 'এটাই শেষ। এ ধরনের কাজ আর তোমাকে করতে হবে না। এরপর তোমাকে দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্ব। নতুন ঢাকায় তোমাকে বাড়ি, গাড়ি সব দেয়া হবে।'

চূড়ান্ত পরিকল্পনা

মোবিনউদ্দিনের মিন্টু রোডের বাড়ি থেকে রাত বারোটায় বেরিয়ে ফরিদাবাদ পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা প্রচণ্ড এক ঘোরের ভেতর হেঁটে হেঁটে এলো জুয়েল। যখন বাড়ি পৌঁছলো রাত তখন একটা পঁয়ত্রিশ।

বাড়ি থেকে ও বেরিয়েছিলো বিকেলে। রাতে কবি কায়কোবাদের সঙ্গে চাইনিজ খেয়েছে। তপুর মা জানতেন না ও খেয়ে আসবে। টেবিলের ওপর ওর খাবার পরিপাটি করে ঢাকা রয়েছে। সেদিকে কোনো নজরই দিলো না জুয়েল। শুধু ঢক ঢক করে আধা বোতল পানি খেয়ে প্যান্ট শার্ট না ছেড়েই আলো নিভিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ওর মাথায় দপ দপ করে হাজারটা মশাল জ্বলছিলো।

গত কয়েকদিন তপুদের পরিবারের সঙ্গে মিশে মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ে, বিশেষভাবে গোলাম কবীরের কাজকর্ম দেখে জামাতের বিরুদ্ধে ওর প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে। মোবিনউদ্দিন আজ যা বললেন তা যদি সত্যি হয়, বিএনপি-কে হটিয়ে যদি ওরা ক্ষমতায় যায়, তাহলে সারা দেশে যে একাত্তরের চেয়ে অনেক বেশি রক্তপাত হবে এটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। জামাত ক্ষমতায় এলে গোলাম কবীর শুধু তপুদের নয়, ওকেও শেষ করে ফেলবে। তার আগেই জামাতকে শেষ করা দরকার। কালা রশিদ কাল খবর দিয়েছে, গোলাম কবীরের লোক নাকি জুয়েলের গতিবিধির উপর নজর রাখছে। অবশ্য ভয় পায়নি সে, তবে বিরক্ত হয়েছে। কালা রশিদকে বলে দিয়েছে গোলাম কবীরের ব্যবস্থা করে ফেলতে। ওর মতো জামাতের আট-দশটা বড় চাঁইকে মেরে ফেলতে পারলে জুয়েল ভেবেছিলো জামাত শেষ হয়ে যাবে। জাহানারা ইমামকে মারার চেয়ে এটা ওর জন্য সহজ ছিলো। ওঁকে মারার ব্যাপারে জুয়েলের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে, তিনি কোনো ক্রিমিনাল নন। সারা দেশের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, দেশের জন্য নিজের ছেলে হারিয়েছেন, স্বামী হারিয়েছেন। আরও সমস্যা হচ্ছে, তিনি ক্যান্সার

আক্রান্ত একজন বৃদ্ধ মহিলা। তাঁর বুকে পিস্তল তাক করলে ওর হাত কি স্থির থাকবে? কর্মীরা যেভাবে ঘিরে রাখে — তাঁকে মারতে গিয়ে কতজন মারা পড়ে তার কি কোনো ঠিক আছে? গুলি করার পর সে নিজেই বা কতটুকু নিরাপদ থাকবে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন — অসংখ্য প্রশ্ন অন্ধকার ঘরে ওর মাথার চারপাশে সাপের মতো ফণা তুলে দুলতে লাগলো।

এর আগে ও খুন করেছে সবগুলো দাগী মাস্তান। পাড়ার লোকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। ভর দুপুরে জিন্দাবাহারের ধলা নাদেরকে মারার পর এক বুড়ি এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেছে। নাদেরের হাতে ওদের তিনজন কর্মী খুন হয়েছিলো ইলেকশনের সময়। এদের মারার ভেতর এক ধরনের বীরত্ব অনুভব করে সে।

বেশির ভাগ লোক অবশ্য খুনোখুনি পছন্দ করে না। অনেকেই ওকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। তপুর সঙ্গে প্রথম বার কথা বলার সময় মনে হয়েছিলো, অনেকে ওকে ঘৃণাও করে। কখনও ও এমনও ভেবেছ — অনেক হয়েছে, আর নয়। কালা রশিদের মতো একটা দোকান-টোকান নিয়ে বসে পড়বে। গ্রাম থেকে ভাইবোদের নিজের কাছে নিয়ে আসবে। নিজে পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি, ভাইবোনকে এম এ পাশ করাবে, নিজে একটা মিষ্টি মেয়েকে বিয়ে করবে, ওর নিজের একটা আলাদা জগৎ হবে। এসব ভাবনা বেশি দূর এগোতে পারেনি। ডাক এসেছে পার্টি অফিস থেকে, শক্তির খেলা দেখাতে হবে প্রতিপক্ষকে। ভুলে গেছে নিজের আলাদা জগতের কথা।

আজ মন্ত্রী মোবিনউদ্দিন স্বপ্নের আরেক জগতের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন ওকে। নতুন ঢাকায় ওর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি থাকবে সম্মানজনক পদ নিয়ে — আগের চেয়ে অনেক মনোহর এই স্বপ্ন।

অনেক ভেবে শেষ রাতে সিদ্ধান্ত নিলো, জাহানারা ইমামকে সে খুন করবে। ভাবলো, তিনি তো জামাতের বিরুদ্ধেই লড়ছেন। তাঁর মৃত্যু যদি জামাতের ধ্বংস ডেকে আনে এতে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। তিনি কি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের ছেলেকে কোরবানি দেননি? একই সঙ্গে তাঁর মৃত্যু জুয়েলকে আশ্চর্য এক স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দেবে — এ পাওয়াও তো কম নয়! তাঁকে খুন করতে হবে জনসভায়, নইলে মানুষকে সেভাবে উত্তেজিত করা যাবে না। আর এ কাজে তপু হবে তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। এ পর্যন্ত ভাবার পর ওর দু' চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। কিন্তু ভালোমতো ঘুমোতে পারলো না সে। আধো ঘুমে স্বপ্ন দেখলো, এক দঙ্গল রাগী রাজহাঁস সাপের ফণার মতো হিলহিলে গলা বাড়িয়ে ওকে তাড়া করছে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য। দৌড়ে পারছে না সে, দম আটকে আসছে — এক সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। চমকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের ভেতর তখনও অন্ধকার, পাড়ার মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছে।

মন্ত্রী মোবিনউদ্দিন গত রাতে জাহানারা ইমামকে খুন করার কথা জুয়েলকে বলেছিলেন শুধু ওকে বারেকের কথামতো যাচাই করে দেখার জন্য। পার্টিতে এ ধরনের কোনো কথা হয়নি। বারেক বলছিলো ও নাকি নির্মূল কমিটিওয়ালাদের সঙ্গে ভিড়তে

চাইছে। সকালে তিনি গোয়েন্দা বিভাগকে জানালেন জুয়েলের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য।

বারেকও জানে জাহানারা ইমামকে খুন করার ব্যাপারে পার্টির কোনো সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু খোদ মন্ত্রী জুয়েলকে কথাটা বলেছেন, সে নিজে সাক্ষী। বারেকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ওকে জানালো, এ সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। ঘুম থেকে উঠেই ও গোলাম কবীরের বাসায় গেলো। বললো, 'মিনিস্টার সাবে জুয়েলের উপর বহুৎ নারাজ হইছেন ওই ইবলিশের গুস্টিরে বাড়িত জাগা দেওনের লাইগা।'

'তা তো বুঝলাম।' গোলাম কবীর এতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না — 'ওদের বাড়ি থেকে বের করছেন কবে?'

'করমু। আসল খবর ওইটা না। মিনিস্টার সাবে জুয়েলরে হুকুম দিছেন জাহানারা ইমামরে ফিনিস করনের লাইগা।'

'কী বললেন?' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো গোলাম কবীর —'সত্যি বলছেন তো?'

'আল্লার কসম। আপনের লগে মিছা কমু ক্যান?'

'আপনাদের পার্টির সিদ্ধান্ত এটা? বেগম সাহেব জানেন?'

'ম্যাডামরে জিগাইয়া এই হগল কাম অয় না। আমগো পার্টির মইদ্যে বহুৎ কিসিমের মাল আছে। মিনিস্টার গো ভিতরে মুক্তিযুদ্ধা কম নাই। হ্যারা হুনলে হাউকাউ লাগায়া দিবো।'

'আপনি নিজে শুনেছেন? সিদ্ধান্ত আবার পাল্টে যাবে না তো?'

'আমার সামনে কতা ওইছে। ডিসিশন পাল্টাইবো না।'

'ওই ছেলে রাজী হয়েছে?'

'ওইবো না ক্যান? ম্যাডামের সিকুরিটির চাকরি পাইবো, বাড়ি গাড়ি পাইবো — অর বাপে রাজী ওইবো!'

'আপনি ওর পেছনে লেগে থাকুন। ঘটনা যদি ঘটাতে পারেন, ইসলামী ব্যাংকে আপনার পনেরো তলা সুপার মার্কেটের লোন আটকাবে না।'

বারেক এটাই চেয়েছিলো। একগাল হেসে বললো, 'আপনেগো একটা কাম করবার লাগবো।'

'কি কাজ!'

'জাহানারা ইমামরে ফিনিস করনের পর জুয়েলরেও খতম কইরা দিতে ওইবো! আপনের নামে বহুৎ খারাপ কতা কইছে মিনিস্টাররে। কয়, আপনি নিকি ক্রিমিনাল। অই পোলার বাপে যে আপনের পেরেসে কাম করতো, হ্যারে বলে আপনে খুন করছেন।

'তাই বলেছে বুঝি!' ঠাণ্ডা গলায় গেলাম কবীর বললো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কথামতো কাজ হয়ে যাবে।'

বারেককে বিদায় করে গোলাম কবীর ছুটলো পার্টির কেন্দ্রীয় দফতরে। গত ফেব্রুয়ারিতে গোপনে আলবদর বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো তাকেই পেয়ে গেলো। পার্টির এই নেতা একাত্তর সালেও আলবদর বাহিনীর হাইকমাণ্ডে

ছিলো। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য তখন যে স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিলো তারও দায়িত্বে ছিলো। গোলাম কবীরের কাছ থেকে বারেকের রিপোর্ট খুবই ঠাণ্ডায় মাথায় শুনলো আলবদরের খুনীদের এই নেতা। তারপর মন্তব্য করলো, 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ! বহুৎ খোশ খবর শোনালেন।'

গোলাম কবীর বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ বলে বসে থাকলে চলবে না।'

'আমাদের কি করতে হবে বলুন জনাব।'

'আমার মনে হচ্ছে, জুয়েল এ কাজ নাও করতে পারে।'

'তাতে পেরেশান হচ্ছেন কেন? বিএনপি যখন এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছে তখন জুয়েল না করলে আমাদের কোনো ছেলে ওর হয়ে কাজটা করে দেবে।'

'বিএনপি অফিসিয়ালি কখনও এটা স্বীকার করবে না। ওরা বরং এটাকে আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চাইবে।'

'চাইলেই কি পারবে জনাব? জুয়েল বিএনপি-র মাস্তান। খোদ মন্ত্রী ওকে বলেছেন, আবদুল বারেক সাক্ষী আছে — আমাদের ওপর কিভাবে চাপাবে?'

'এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

'জরুর জনাব। আমাদের বদর বাহিনীর ছেলেরা জুয়েলকে নজরে রাখবে।'

'আবদুল বারেক বলছিলো, জাহানারা ইমামকে মারার সঙ্গে সঙ্গে জুয়েলকেও মেরে ফেলতে হবে। তারা চায় এ কাজ আমরা করি।'

'তার মানে তারা প্রমাণ রাখতে চায় না'। নেতা হেসে বললো, 'না জনাব, জুয়েলকে আমরা মারবো না, তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবো জাহানারা ইমামের খুনী হিসেবে।'

'সে যদি খুন না করে!'

'সে ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ছেলেরা জাহানারা ইমামকে খুন করার পর জুয়েলকেও পিটিয়ে মেরে ফেলবে।'

'জুয়েল যদি জাহানারা ইমামের মিটিঙে না যায়!'

'যাতে যায় তার ব্যবস্থা আবদুল বারেককে করতে হবে।'

জাহানারা ইমামকে খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে দু'দিন গভীরভাবে ভাবলো জুয়েল। পর পর অনেকগুলো ছক বাতিল করে শেষ পর্যন্ত মনমতো একটা ছক দাঁড় করিয়ে গেলো বারেকের সঙ্গে আলোচনা করতে। বারেকের সহযোগিতা ছাড়া এ পরিকল্পনা সে কাজে লাগাতে পারবে না। ওকে গিয়ে বললো, 'আমার প্ল্যান রেডি কইরা ফালাইছি। আপনের একটা কাম করন লাগবো।'

বারেক আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলো — 'কি কাম?'

'আমি চিন্তা কইরা দেখছি, এ কামে আমগো পোলাপাইনরে লগে রাখন যাইবো না। মোবিন বাই কইছে এইটারে জামাতীগো কাম কইয়া চালাইতে। আপনে জামাতের লগে কথা কন। অগো দুইটা পোলা লাগবো আমার। জামাতের পোলারা ডিসিপ্লিন মাইনা কাম করে।'

জুয়েলের কথা শুনে বারেক খুশিই হলো। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এটা একটা চমৎকার সুযোগ। পাছে জুয়েল মত পাল্টায় — ব্যস্ত গলায় বললো, 'তুমি কুন চিন্তা কইরো না। আমি ব্যবস্থা কইরা দিমু।'

'হ্যারা দিবো?'

'দিবো না ক্যান? তাগো কাম খাতিরজমা আমরা কইরা দিতাছি না?' এই বলে খিক খিক করে হাসলো আবদুল বারেক।

বারেকের প্রতিশ্রুতি পেয়ে জুয়েল নিশ্চিন্ত হলো। জামাতের কর্মীদের ওর পরিকল্পনায় ঢোকাতে পারলে এর দায়দায়িত্ব জামাতকে নিতেই হবে। নিজেকে আড়াল করার জন্য দরকার হলে জামাতী দুটোকে ও স্পটেই মেরে ফেলবে। নিজের পরিকল্পনায় আর কোনো খুঁত দেখতে পেলো না। এবার অপেক্ষা করতে হবে জাহানারা ইমামের কোন্ মিটিঙে লোক কম হয় তার জন্য।

পরিকল্পনার এই পর্যায়ে জুয়েলের দরকার হলো তপুকে। এক শুক্রবারে ওকে একাই সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলো। ফেরার পথে ঢুকলো কফি হাউসে। ফ্রায়েড চিকেন, ফিঙ্গার চিপস আর কোকের অর্ডার দিয়ে খুব সাধারণভাবে তপুকে বললো, 'আজকাল তুমি নির্মূল কমিটির কাজে যাও না?'

প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তপু বিব্রত বোধ করলো। জুয়েলকে এ কথা তো বলা যাবে না যে, ওর জন্য নির্মূল কমিটির লোকজনরা তপুকে সন্দেহের চোখে দেখে। বললো, 'অফিসে খুব একটা যাই না। মিটিঙ মিছিল থাকলে যাই।'

'যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো সেদিন তোমাদের মিটিঙে অনেক লোক হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, গণআদালতের পর আন্দোলনের নতুন কী কর্মসূচী দেন সেটা জানার জন্য লোক বেশি গিয়েছিলো।'

'কেন তোমাদের সব মিটিঙে লোক বেশি হয় না?'

'সমন্বয় কমিটির প্রোগ্রাম হলে লোক বেশি হয়। শুধু নির্মূল কমিটির হলে অত লোক হয় না।'

'সমন্বয় কমিটির মিটিঙে লোক বেশি হয় কেন?'

'বা রে! সমন্বয় কমিটিতে সবগুলো রাজনৈতিক দল আছে না? তাছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলো আছে, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন আছে — সব মিলিয়ে সত্তরের ওপর হবে সমন্বয় কমিটির দলের সংখ্যা। নির্মূল কমিটিও ওর ভেতর একটা দল।'

'নির্মূল কমিটির সব মিটিঙে জাহানারা ইমাম যান?'

নির্মূল কমিটির ব্যাপারে জুয়েলের এ ধরনের প্রশ্ন শুনতে শুনতে হঠাৎ তপুর মনে পড়লো সামাদের কথা। সামাদ বলেছিলো ওদের ভালো করে পোষ মানিয়ে জুয়েল ওর কাছ থেকে নির্মূল কমিটির গোপন খবর বের করবে। যদিও এ পর্যন্ত গোপন কোনো কথা সে বলেনি, আর তেমন গোপন কথা ওর জানাও নেই, তবু সতর্ক হয়ে গেলো। জুয়েলের শেষ প্রশ্নের ছোট্ট জবাব দিলো — 'যান।'

'নির্মূল কমিটির গত মিটিঙে লোক কী রকম হয়েছিলো?'

'চার পাঁচ হাজার হবে।'

'এ আর এমন বেশি কী!'

জুয়েলের তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তপু আহত বোধ করলো। বললো, 'কমই বা কি! বড় বড় দু তিনটা দল ছাড়া চার পাঁচ হাজার লোকের মিটিঙ করা সোজা কাজ না। আমরা তো পয়সা দিয়ে লোক আনি না।'

'জাহানারা ইমামের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?'

'না।' একটু থেমে তপু পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আজ নির্মূল কমিটি নিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?'

'কেন, জানতে দোষ কি?'

'আপনি তো বিএনপি করেন।'

'তাতে কী! আমি সময় পেলে যে তোমাদের মিটিঙ শুনতে যাই সে তো তুমি নিজেই দেখেছো।'

তপু মাথা নেড়ে সায় জানালো। কদিন আগে জুয়েলকে ও 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়তে দেখেছে। বললো, 'একাত্তরের দিনগুলি' আপনার কেমন লেগেছে?'

'ভালো।' একটু হেসে জুয়েল বললো, 'তুমিই তো পড়তে বলেছিলে।'

'কোন জিনিসটা ভালো লেগেছে?'

'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যায়।'

'রুমির জন্য কষ্ট হয় না?'

'আমার ওসব ফিলিংস কম। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অনেক লোক মরেছে। তোমার চাচাও তো মরেছে। আমি থাকলে আমিও মরতাম। আলাদা করে একজনের জন্য কষ্ট হবে কেন?'

জুয়েলের কথা তপুর পছন্দ হলো না। ও বলতে চাইলো — 'মুক্তিযুদ্ধে অনেক লোক মরেছে বলা উচিৎ নয়, বলতে হয় শহীদ হয়েছেন।' কথাটা বলতে গিয়েও বললো না। জুয়েল এতে অসন্তুষ্ট হতে পারে।

'এ মাসে তোমাদের নির্মূল কমিটির কোনো জনসভা আছে?' এতক্ষণ পর আসল প্রশ্নে এলো জুয়েল।

'আছে। সামনের আঠারো তারিখে। যাবেন শুনতে?'

'সময় পেলে যাবো।'

তপুর কাছ থেকে যা জানা দরকার সব জানা হয়ে গেছে জুয়েলের। নিজের হাতে ওর প্লেটে ফ্রায়েড্ চিকেন আর ফেঞ্চ ফ্রাই তুলে দিয়ে নরম হেসে বললো, 'খাও।'

কালা রশিদ বললো, 'ওস্তাদ, তোমার পিছে জামাতীরাও স্পাই লাগাইছে। কাইল গলির মুখের থনে একটারে ধরছিলাম।'

জুয়েল ওর ঘরে বসে মদ খাচ্ছিলো। বললো, 'জানি। খালি জামাতী না, আইবি-র টিকটিকিও আমার উপরে নজর রাখে।'

'ক্যান ওস্তাদ? পাটিতে কুন গড়বড় ওইছে?'

'না বে! গড়বড় ওইবো ক্যান। বারেক বাই কইলো গোলাম কবীর নিকি আমারে বেকায়দায় পাইলে এ্যাকশন করবার পারে। হ্যার লাইগা মোবিন ভাইরে কইয়া আইবি দুইটারে দিছে ওয়াচ করনের লাইগা।'

'খালি গোলাম কবীর না ওস্তাদ, জামাতীরাও তোমারে মারণের প্ল্যান করতাছে।'

জুয়েল তখন নেশার ঘোরে ছিলো। কদিন ধরে চার দিক থেকে ওর স্নায়ুর ওপর এত চাপ পড়ছে যে, কালা রশিদের এখানে না এসে ওর উপায় ছিলো না। জুয়েল বাড়িতে কখনও মদ খায় না। খুব টেনশনে থাকলে এখানে এসে খায়। জামাতীরা তাকে মারার জন্য টার্গেট করেছে। এ খবর ও আরও এক সূত্র থেকে পেয়েছে। বললো, 'জামাতীগো মরণ ঘনায়া আইছে। হ্যার লাইগা বেশি ফাল পাড়তাছে।'

'আমাগো দুইটা পোলারে লগে রাখেন। কোনসুম কি অয় কওন যায় না। জামাতীরা পিঠে ছুরি মারণের ওস্তাদ।'

'লাগবো না দোস্ত!' জড়ানো গলায় জুয়েল বললো, 'ব্যাঙ্কে আমার কত ট্যাকা আছে?'

টাকাপয়সার হিসেবে রাখতে বিরক্ত বোধ করে জুয়েল। কালা রশিদের সঙ্গে ওর জয়েন্ট ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা যা আসে রশিদকে দেয় ব্যাঙ্কে রাখার জন্য। চেক বইও ওর কাছে। জুয়েল আগে কখনও জানতে চায়নি ব্যাঙ্কে কত আছে। রশিদ একটু অবাক হয়ে বললো, 'লাখ পাঁচ ছয় ওইবো ওস্তাদ। ট্যাকা লাগবো?'

'আমার লাগবো না। কাঠ মঞ্জু দুই লাখ ট্যাকা চাইছে। অর ব্যবসায় লাগাইবো। মাসে মাসে চাইর হাজার কইরা লাভ দিবো।'

'অরে দিবার পারো ওস্তাদ। তোমার ট্যাকা মাইর যাইবো না।'

'দোস্ত, তরে একটা কতা কইবার চাই।'

'কও ওস্তাদ!'

'আমার কিছু ওইলে তুই তপু-নিতুগো দেখভাল করবি।'

'এইটা কি কইলা ওস্তাদ! আমরা জিন্দা থাকতে তোমারে কোন হালায় কি করবো!'

জুয়েল কালা রশিদের দুই হাত ধরে জড়ানো গলায় বললো, 'তুই আমারে কথা দে দোস্ত। অগো তুই দেখবি?'

জুয়েলকে বুকে জড়িয়ে ধরে রশিদ বললো, 'তোমার লাইগা জান দিবার পারি ওস্তাদ, এইটুক পারুম না!'

'দোস্ত, তুই আমার জান!'

এরপর জুয়েলের আর কথা বলার মতো অবস্থা ছিলো না। কালা রশিদ ওকে ধরে রিকশায় করে ওর বাড়িতে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে, তপুকে বলে তারপর ফিরলো। ভেতরে ভেতরে খুবই উদ্বেগ বোধ করছিলো সে। বলতে গেলে ওকে বছর তিনকে আগে বস্তি থেকে তুলে এনেছে জুয়েল। গত বছর ওকে নয়া বাজারে রড সিমেন্টের দোকান কিনে দিয়েছে। ব্যবসার জন্য নগদ দিয়েছে তিন লাখ। সব খরচ বাদ দিয়ে দোকান থেকে কালা রশিদের মাসে পনেরো ষোল হাজার টাকা আয় হয়। জুয়েল না থাকলে বাকি জীবন বস্তিতে মাস্তানি করেই কাটাতে হতো। ওর পিঠের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে দিলেও এই ঋণ শোধ হবে না।

শেষ পরিণতি

জুয়েলের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে কালা রশিদ, লেখাপড়া বেশি করেনি। কোনোরকমে ক্লাস টেন পর্যন্ত উঠেছিলো, তারপর পুরোপুরি মাস্তান হয়ে যায়। প্রথমে পাড়া, তারপর মহল্লা, দেখতে দেখতে রাজনৈতিক দলগুলোর নজরে পড়ে গেলো। সবাই ওকে দলে টানতে চেয়েছিলো, নিরাপদ ভেবে তখন এরশাদের পার্টির সঙ্গে জুটে গিয়েছিলো। গায়ে তেমন জোর নেই, হালকা পাতলা গড়ন, পিস্তলের নিশানা একেবারে নিখুঁত আর দুদার্ন্ত রকমের সাহসী। জুয়েলের নজরে পড়েছিলো ওর তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির জন্য। যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে।

জুয়েলের সঙ্গে কথা বলায় ও বুঝে ফেললো, ওর ওপর ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জামাতীরা যখন টার্গেট করেছে, এ নিয়ে ভালোভাবেই মাথা ঘামাতে হবে। দুটো বিষয় কালা রশিদের কাছে খট্‌কা লেগেছে। তপুদের আশ্রয় দেয়ার জন্য গোলাম কবীর ক্ষেপতে পারে জুয়েলের ওপর, কারণ তপুর চাচা ওর বাপকে খুন করেছে, কিন্তু ওদের গোটা পার্টি কেন ক্ষেপবে? আরেকটা ব্যাপার ও বুঝতে পারছে না — আবদুল বারেক যেখানে জুয়েলের ওপর এতটা অসন্তুষ্ট তখন ওর নিরাপত্তার জন্য আইবি নজর রাখছে, এটা কেমন কথা! কালা রশিদ জানে, ওদের মতো মাস্তানদের সঙ্গে দলের নেতৃত্বের যদি কখনও কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তখন ওদের একমাত্র পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। জুয়েলের উচিৎ হয়নি তপুদের ঝামেলা কাঁধে নিয়ে বারেকের সঙ্গে একটা বিরোধে যাওয়া। তারপরও জুয়েলের নিরাপত্তার ষোলআনা দায়িত্ব ওকে পালন করতে হবে। ওদের দুজনের ভেতর এটা একটা অলিখিত সমঝোতা। জুয়েলের ওপর যে কোনো দিক থেকে আঘাত এলে সেটা ঠেকাতে হবে। কালা রশিদ তার গোয়েন্দা বাহিনীকে লাগালো আরও খবর বের করার জন্য। মাস্তানদের এই এক সুবিধা — যে দলের সঙ্গেই যুক্ত থাক না কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে

বোঝাপড়া আর মত বিনিময়ের একটা জায়গা থাকে।

আবদুল বারেককে জুয়েল জানিয়ে দিয়েছে জাহানারা ইমামের আঠারো তারিখের জনসভায় ও টার্গেট হিট করবে। জামাতের কিলিং স্কোয়াডের ছেলে দুটোকে বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের কাজ কী হবে। ওর পরিকল্পনায় কোনো ফাঁক নেই।

তপুর কাছ থেকে জেনেছে মিটিং হবে জিপিও-র সামনের রাস্তায়, মঞ্চ হবে পশ্চিমমুখী। জামাতের ছেলে দুটো থাকবে জিপিও-র ছাদে, ওদের কাছে থাকবে রাইফেল। জুয়েলের দুটো ছেলে ওদের পাহারা দেবে। জুয়েল থাকবে মিটিঙের ভেতর। ও লক্ষ্য করেছে, জনসভার মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিকরা জাহানারা ইমামকে কিছু বলার জন্য দাঁড়াতে বলে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে ডাইনে বামে মুখ ঘুরিয়ে শ্রোতাদের বসতে বলেন, আর ক্যামেরাম্যানরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে। তাঁকে হিট করার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। জামাতের ছেলে দুটোকে জিপিও-র ছাদে নিয়ে ওদের কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে জুয়েল। জাহানারা ইমামের বক্তৃতার সময় ওর ছেলেরা বায়তুল মোকাররমের গেট-এ পটকা ফাটাবে। পুলিশ ছুটে যাবে সেদিকে। লোকজনও কিছু উঠে দাঁড়াবে। জাহানারা ইমাম দু'হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলবেন। তখনই গুলি এসে তাঁর কপালে লাগবে। এরপর জুয়েলের ছেলেরা পুলিশের ওপর হামলা করবে। পুলিশ লাঠিচার্জ করবে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে, লোকজনদের ধাওয়া করবে আর জিপিও-র ছাদ থেকে ওরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যাবে।

জামাতের ছেলে দু'টো যথাসময়ে জুয়েলের পরিকল্পনার কথা ওদের নেতাকে জানিয়েছে। নেতা ওদের বলেছে সেভাবেই কাজ করতে। জুয়েলের জন্য নেতা শিবিরের অচেনা ছাত্র কর্মীদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা করেছে। জনসভায় শিবিরের চোদ্দ পনেরোটা ছেলে সারাক্ষণ ছায়ার মতো ওর পেছনে লেগে থাকবে। যে মুহূর্তে জাহানারা ইমামকে গুলি করা হবে ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা জুয়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলবে, এ গুলি ছুঁড়েছে। জুয়েলের কাছে সব সময় পিস্তল থাকে। পাবলিক ছেলেদের কথা বিশ্বাস করে গণপিটুনি শুরু করবে। ছেলেরা নিরবে স্পট থেকে বেরিয়ে আসবে। আঠারো তারিখে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট-এ জামাতের জনসভা আছে। নির্মূলওয়ালাদের মিটিঙ ভাঙতে কোনো ঝামেলাই হবে না।

জনসভায় দুদিন আগে মোবিনউদ্দিন জুয়েলকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে জানতে চাইলেন, 'তোমার কাজের কদ্দুর!'

ওর পরিকল্পনার কথা যতটুকু মন্ত্রীকে বলা দরকার ততটুকুই ও বললো। সব শুনে মন্ত্রী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি। আজ থেকে এ ব্যাপারে সব ভুলে যাও। আমি তোমাকে জাহানারা ইমামকে খুন করার কথা বলেছিলাম ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন ভাববে না।'

'আপনি এসব কি বলছেন মোবিন ভাই!' জুয়েল আকাশ থেকে পড়লো — 'সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে, টাকাপয়সা সব খরচ হয়ে গেছে — হঠাৎ কেন মত পাল্টালেন?'

'এটা কখনও আমাদের মত ছিলো না। বারেক বলছিলো, তুমি নাকি নির্মূল কমিটির সঙ্গে জুটে গেছো, তাই তোমায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য কথাটা বলেছিলাম।

তুমি পরীক্ষায় পাস করেছো।'

'কিন্তু মোবিন ভাই, আপনি যে বললেন এতে করে জামাতকে শায়েস্তা করা সহজ হবে—।'

'না জুয়েল। জামাতকে এভাবে শায়েস্তা করা যাবে না। আমাদের ইন্টালিজেন্স খবর দিয়েছে ওরা তোমাকে ফাঁসাবে। সবাই জানে, তুমি আমাদের লোক। পরশুদিন তুমি জনসভার ধারে কাছেও যাবে না। বরং গ্রামের বাড়ি গিয়ে থেকে আসো দুদিন।'

'এখন কিভাবে বাড়ি যাবো মোবিন ভাই?' জুয়েল একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'সবাইকে অপারেশন থেকে উইথড্র করতে হবে না? শুধু আমার ছেলেরা নয়, জামাতের দুটো ছেলেও তো এর মধ্যে আছে। আমি ওদের দিয়েই হিট করতে চেয়েছিলাম।'

'না জুয়েল, এখন কোনো অবস্থায় জাহানারা ইমামকে হিট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার ছেলেদের উইথড্র করো। জামাতের ছেলে দুটোকেও বারণ করে দাও। জিপিও-র ছাদে পুলিশ পাহারা দেবে।'

একটু চুপ থেকে জুয়েল তিক্ত গলায় বললো, 'আমাকে নতুন যে দায়িত্ব দেবেন বলেছিলেন সেটাও কী কথার কথা ছিলো?'

'না জুয়েল।' মৃদু হেসে মন্ত্রী বললেন, 'তুমি আমাদের পার্টির একটা এ্যাসেট। নতুন দায়িত্ব তোমাকে ঠিকই দেয়া হবে। তবে সময় লাগবে।'

'আমি আর এসব কাজে থাকতে চাই না। এরপর ছেলেরা আমাকে ভীরু কাপুরুষ ভাববে। আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারবে। একাজ থেকে আমাকে রেহাই দিন।'

'ঠিক আছে। যখন থাকতে চাইছো না, তোমাকে জোর করবো না। তোমার গ্রুপগুলো বারেক সাহেবকে বুঝিয়ে দিও। আমি সুযোগ মতো ম্যাডামের সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কথা বলবো।'

মোবিনউদ্দিনের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাতেই জুয়েল বারেকের বাড়ি গেলো। বারেক জানতো যে, মন্ত্রী জুয়েলকে শেষ মুহূর্তে কাজটা করতে দেবে না। তবে ওর গ্রামের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা বারেকও অনুমোদন করলো না। গোলাম কবীরের সঙ্গে ওর যা কথা হয়েছে সে অনুযায়ী জুয়েলকে অবশ্যই জনসভায় থাকতে হবে। গোলাম কবীর ঠিকই বলেছিলো, শেষ মুহূর্তে জুয়েল বেঁকে বসতে পারে। বেঁকে না বসলেও ব্যাপারটা তো একই দাঁড়ালো। জাহানারা ইমামকে খুন করার দায়িত্বটা জামাতকে নিতে হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে জুয়েলকে এর জন্য দায়ী করা হবে।

বারেক বললো, 'মোবিন ভাই মিনিস্টার ওইবার পারেন, মগর ফিল্ড-এর কাম বোজেন না। তুমি জামাতরে খ্যাতের মূলা দ্যাহায়া দিছ। তুমি কী মনে করছ? তুমি খুন না করলে হ্যারা বয়া বয়া বুড়া আঙ্গুল চুসবো? আমরা তো মনে অয় নির্মূলঅলাগো খবর দেওন দরকার, তোমারও মিটিঙে থাকন দরকার। জিপিও-র ছাদ ছাড়া অন্য কোনখান থেইকা ওনারে টারগেট করবার পারে, তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবো না।'

বারেকের কথায় যুক্তি আছে। জামাতকে বারণ করলেই যে ওরা কথা শুনবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু জুয়েল বললো, 'আপনে জামাতরে আমগো ডিসিশন

জানায় দেন। বইলেন উল্টাসিদা কিছু করলে ফাইড়া ফালামু। আমি দেখি কী করন যায়।'

'মিটিঙে তোমার থাকনই লাগবো জুয়েল। নাইলে তোমার উছিলায়, খোদা নাখাস্তা, বুড়া অসুইখ্যা মায়্যা মানুষটার যদি কিছু হয় . . . ' বারেক জানে জুয়েলের দুর্বল জায়গা কোন্‌টা।

রাতে জুয়েলের বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটা বেজে গেলো। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখে, তপুর মা ওর টেবিলে খাবার গুছিয়ে রাখছেন। অবাক হয়ে ও বললো, 'খালা, আপনি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন?'

কৈফিয়তের সুরে তপুর মা বললেন, 'তুমি কোন রাতে আসো, ঠাণ্ডা ভাত তরকারি খাও — তাই গরম করে রেখে যাচ্ছিলাম।'

গ্রামে জুয়েলদের বিরাট বাড়ি। বাপ চাচারা মিলে ছয় জন, তাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা চব্বিশ পঁচিশটা হবে, এ ছাড়া কাজের লোকেরা আছে। এক হাড়িতে রান্না হয়। পুরো সংসারের দায়িত্ব ওর মা'র কাঁধে। চাচীরা সাহায্য করেন বটে, তারপরও সংসারের সব কাজ সামাল দিতে গিয়ে নিজের ছেলেমেয়েরা কে কখন খাচ্ছে সেদিকে মা'র নজর দেয়ার সময় নেই। মায়ের যত্ন কি জিনিস তপুর মাকে না দেখলে এ অভিজ্ঞতা জুয়েলের অজানা থেকে যেতো। ঘরবাড়ির চেহারা তো এখানে আসার প্রথম দিনই পাল্টে ফেলেছেন। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় এতটুকু ময়লা হয় না, কুঁচকে থাকে না, সারা ঘরে কোথাও একরত্তি ধুলো জমে থাকে না। রান্না যে এত উপাদেয় হতে পারে সেটাও জুয়েলের জানা ছিলো না। গভীর মমতা দিয়ে বাড়ির ছোট বড় সবগুলো মানুষ ওকে ঘিরে রেখেছে — ভাবতে গেলে বুকটা ভরে যায়।

সেই যে দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে, তারপর কয়েক কাপ চা ছাড়া ওর পেটে তেমন কিছু পড়েনি। মন্ত্রীর বাড়িতে শুধু দুটো বিস্কুট খেয়েছিলো। ভাঁপ ওঠা মুরগির মাংশের ঝোলের গন্ধে ওর খিদে আরও বেড়ে গেলো। খেতে খেতে তপুর মাকে বললো, 'আমার জন্য আপনি এত কষ্ট করেন — মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে।'

'কষ্ট কিসের বাবা! তোমার মা কাছে থাকলে তিনিও করতেন।'

'তাঁর সময় কোথায়? বারো ভূতের সংসার সামলাতে গিয়েই হিমসিম খেয়ে যান।'

'আমার তো সময় আছে! পাঁচজনের সংসারে কিই বা এমন কাজ!'

'খালা, আপনি আর দাদী সেলাইয়ের কাজ ছেড়ে দেন, কালা রশিদ সামনের মাস থেকে আপনাকে চার হাজার করে টাকা দেবে। আর যা দরকার আমি দেবো!'

মা মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা বুঝি সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চিরকালের জন্য তোমার ঘাড়ে সোয়ার হয়েছি।'

. 'এভাবে কেন বলছেন খালা! আপনারা না এলে কোন দোজখে থাকতাম সে তো দেখেছেন!'

'তুমি এবার একটা বিয়ে করো। বউ সব গুছিয়ে রাখবে!'

'আমাকে কে মেয়ে দেবে? বাজারে যা সুনাম!'

কথাটা মা বহুদিন ধরে বলবেন ভাবছিলেন, সুযোগ পাচ্ছিলেন না। মনে হলো এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ। বললেন, 'বাবা, কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা বলি। ছেড়ে দাও না এসব মাস্তানি। ফুলের মত নরম মন তোমার। কেন এসব করতে যাও? নিজে ছোটখাট একটা কিছু করো। আমরা সবাই মিলে খাটবো। দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না।'

ম্লান হেসে জুয়েল বললো, 'যারা এসব কাজে একবার ঢোকে তারা কোনোদিন বেরুতে পারে না। আমার কপাল ভালো বলতে হবে। আজ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁকে বলে দিয়েছি, আমি আর এসব কাজ করবো না। তিনি বলেছেন একটা চাকরির ব্যবস্থা করবেন।'

'আমার বুকটা ভরে গেলো, বাবা। তুমি আমাদের কোনো অভাবই রাখোনি, তবু এখানে আসার পর থেকে একটা অস্বস্তি সব সময় ছিলো, মনে হতো, হালাল কামাই খাচ্ছি তো! সে জন্যে নিজেরা কাজ করে যতটা পেরেছি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি।'

জুয়েল গম্ভীর হয়ে বললো, 'কালা রশিদ যে টাকা আপনাকে দেবে সেটা হালাল কামাইয়ের টাকা। আমার বাপের দেয়া টাকা। সৎ ব্যবসায় খাটিয়েছি।'

পরদিন কালা রশিদ জুয়েলের কাছে আঠারো তারিখের অপারেশন বাতিলের খবর শুনে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো। বিশেষ করে বারেক যেভাবে জুয়েলকে জনসভায় থাকতে বলছে সেটা ওর ভালো লাগলো না। বললো, 'ওস্তাদ, একটা কাম করবা?'

'কি কাম!'

'তপুরে লয়া গিয়া তুমি জাহানারা ইমামের লগে দ্যাখা কর। ওনারে কও কাইল মিটিঙে না আসতে!'

'আমার কথা উনি শুনবো ক্যান?'

'শুনবো। কইবা, জামাতীরা ওনারে এ্যাকশন করনের প্ল্যান করছে।'

'ওনার পোলাপাইনরা আমার কথা শুনলে কি করবো চিন্তা করতে পারস?'

'কি করবো? অগো জানের ডর নাই! তুমি তো অগো ভালা করবারই যাইতাছ, উল্টা তোমারে খাতির করবো।'

'আর আমগো পোলাপাইনরা যখন শুনবো?'

'বারেক ভাই তোমারে কইছে নির্মূলগো খবর দিতে! কইবা, তার ডিসিশন।'

কালা রশিদের প্রস্তাব মন্দ নয়। জুয়েল ভাবলো, জাহানারা ইমাম যদি কাল জনসভায় না যান তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে সে বেঁচে যায়। বিকেলে তপু স্কুল থেকে ফেরার পর ওকে বললো, 'তুমি কি জাহানারা ইমামের বাসা চেনো?'

তপু অবাক হয়ে বললো, 'না জুয়েল ভাই, কেন?'

'তাঁর সঙ্গে আমার জরুরি দরকার! আজই দেখা করতে হবে।'

বিএনপি-র একজন মাস্তান, যতই সে 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ুক, তাকে নিয়ে জাহানারা ইমামের বাসায় যাওয়া উচিৎ হবে না — ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিলো তপুকে। বললো, 'আজ দেখা করতে চাইলেই কি তিনি দেখা করবেন? আপনাকে তিনি চেনেন না। হুট্ করে তাঁর বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

জুয়েল একটু অধৈর্য হয়ে বললো, 'তপু, তুমি জানো না তাঁর মস্ত বিপদ। জামাতীরা তাঁকে খুন করার প্ল্যান করেছে। কালই ওরা হামলা করবে।'

জুয়েলের কথা শুনে ভয়ে তপুর গলা শুকিয়ে গেলো। কোনো রকমে ঢোক গিলে বললো, 'আপনি কিভাবে জানলেন?'

'তর্ক কোরো না তপু। আমাদের জানতে হয়। হাতে বেশি সময় নেই। ওঁর ঠিকানা কোথায় পাবো?'

তপু ভেবে দেখলো, সূত্রাপুরের অফিস থেকে ঠিকানা নিতে গেলে অসুবিধে হতে পারে। বরং তোপখানা রোডের অফিস থেকে ঠিকানা পাওয়া সহজ হবে। সেখানে দু একজন তপুকে চেহারায় চেনে। জুয়েলকে সঙ্গে নিয়ে তখনই সে বেরিয়ে পড়লো।

তোপখানা রোডের অফিসে কর্মীসভা হচ্ছিলো। অফিসঘরের বাইরেও ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। অনেকে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জুয়েলকে নিয়ে তপু বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

অফিসঘরে টিপুকে একা পাওয়ার জন্য তপু আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। সূত্রাপুরের কর্মী হিসেবে টিপু ওকে চেনে, নাম জানে না। দেখে বললো, 'তুমি কি কর্মীসভায় এসেছিলে? সামাদ ভাইরা তো চলে গেছেন।'

তপু বললো, 'জানি, আপনার কাছে দরকার ছিলো।'

'কী দরকার বলো?'

'জাহানারা ইমামের ঠিকানাটা আমার দরকার।'

এক টুকরো সাদা কাগজে ঠিকানা লিখতে লিখতে টিপু জিজ্ঞেস করলো — 'ঠিকানা দিয়ে কী করবে?'

'ওনার বইতে একটা আটোগ্রাফ নেবো।'

দেখা করার অজুহাত হিসেবে জুয়েলের 'একাত্তরের দিনগুলি' বইটা তপু সঙ্গে নিয়েছিলো। জাহানারা ইমামের বাড়ি খুঁজে বের করতে করতে নটা বেজে গেলো।

বড় লোহার গেটওয়ালা ছোট দোতলা বাড়ি। গেট-এর পাশে দু'জন পুলিশ আর একজন দারোয়ান বসা। জুয়েল দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস জাহানারা ইমাম বাসায় আছেন?'

'আছেন। কি বলবো?'

তপু বললো, 'বলবেন, আমরা সূত্রাপুরের নির্মূল কমিটি থেকে এসেছি। খুব জরুরী দরকার।'

দারোয়ান ওদের অপেক্ষা করতে বলে দোতলায় গেলো। কিছুক্ষণ পর নেমে এসে বললো, 'এখন দেখা হবে না। ওনারা মিটিঙে আছেন।'

জুয়েল বিরক্ত হয়ে বললো, 'কাদের মিটিঙ?'

'এমপি রাজ্জাক সাহেব আছেন, হাসান ইমাম সাহেব আছেন, কাজী আরেফ সাহেব আছেন, প্রফেসর মান্নান সাহেব আছেন — '

বাধা দিয়ে তপু বললো, 'আপনি বলেননি খুব জরুরী দরকার?'

দারোয়ান ওপরে গিয়ে মিটিঙের মাঝখানে কথা বলার জন্য ধমক খেয়েছে।

বললো, 'ওপরে যেটা হচ্ছে সেটা বেশি জরুরী। এখন যান, পরে আসবেন।'

জুয়েল জানতে চাইলো — 'মিটিঙ কখন শেষ হবে?'

'কোনো ঠিক নাই। এক একদিন রাত বারোটা একটা পর্যন্ত মিটিঙ চলে।'

'মিটিঙের পরে দেখা করা যাবে?'

দারোয়ান বিরক্ত হয়ে বললো, 'উনি অচেনা কারও সঙ্গে বাসায় দেখা করেন না। দরকার থাকলে অফিসে দেখা করবেন।'

তপুকে নিয়ে জুয়েল হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে এলো। বললো, 'কাল মিটিঙে যাবো। মনে হয় না জামাতীরা কিছু করার সাহাস পাবে। তবু খেয়াল রাখতে হবে।'

জাহানারা ইমামের জন্য জুয়েলের এই উদ্বেগ তপুর ভালো লাগলো। বললো, 'আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।'

তপু বলেছিলো স্কুলের একটা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ও চারটার আগেই জিপিও-র গেট-এ জুয়েলের সঙ্গে দেখা করবে। জুয়েল সাড়ে তিনটায় চলে এসেছে জনসভার জায়গায়। দেখলো, কালা রশিদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের ওপর। ওর জন্য কালা রশিদের উদ্বেগ দেখে হেসে ফেললো — 'তরে আইবার কইছে ক্যাঠায়? আমগো গোলাপানে দেখলে কি কইবো!'

'তুমি জান বাজি কইরা আইবার পারবা ওস্তাদ, আর আমি বুঝি গরে বয়া মাক্ষি মারুম!'

'নির্মূলগো কুন খবর নাই, ওইদিকে জামাতীরা বিরাট মিটিঙ করবো মনে অয়।'

জনসভার মঞ্চে তখন মাইক পরীক্ষা করছিলো একজন, দু' জন সাংবাদিকদের বসার জন্য চেয়ার সাজাচ্ছিলো। সব মিলিয়ে শ' দুয়েক লোক এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, নেতারা কেউ আসেন নি। কালা রশিদ বললো, 'জামাতীরা একই দিনে মিটিঙ ফালায়া ভালাই করছে। নির্মূলের পোলাপানরা এ্যালার্ট থাকবো।'

জুয়েল বললো, 'উল্টা কারবারও ওইবার পারে। জামাতীরা যদি এ্যাটাক করে নির্মূলের পোলাপানরা সামাল দিবার পারবো না।'

'না ওস্তাদ, এ্যাটাক করবো না। দেখছ কেমন পুলিশ বহাইছে? জিপিও-র ছাদ ইস্তক ভইরা ফালাইছে।'

জুয়েল মনে মনে হাসলো। মন্ত্রী মোবিনউদ্দিন তাহলে কড়া ব্যবস্থাই নিয়েছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'দোস্ত, তবু তুই জামাতীগো মিটিঙের দিকে খেয়াল রাখিস। যদি দ্যাখস এদিকে হামলা করবার আইতাছে, সিধা গুলি চালাইবি।'

কালা রশিদ বললো, 'আমি তাইলে সামনে গিয়া পজিশন লই গা।'

ও চলে যাওয়ার একটু পরে তপু এলো। একটা দুটো করে ছোট ছোট মিছিল আসা আরম্ভ করেছে। সাড়ে চারটা নাগাদ জাহানারা ইমাম আর অন্য নেতারা মঞ্চে উঠলেন। জনসভার লোক তখন খুব বেশি হলে হাজার দুয়েক।

দূর থেকে সূত্রাপুরের মিছিল আসতে দেখে জুয়েল তপুকে বললো, 'তুমি আমার কাছে থেকো না। তোমাদের মিছিল আসছে। ওদের সঙ্গে থাকো।'

কথাটা তপুরও মনে হয়েছে। জুয়েলের সঙ্গে ওকে দেখলে সামাদরা আজেবাজে কথা বলার সুযোগ পাবে। ম্লান হেসে বললো, 'জুয়েল ভাই, আপনি সাবধানে থাকবেন।'

জুয়েল ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, 'তুমিও সাবধানে থেকো।'

পৌনে পাঁচটায় বক্তৃতা শুরু হলো। জুয়েল নির্মূল কমিটি এবং সম্ভাব্য ঘাতকদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য বসেছিলো জিপিও-র গেট-এর পাশে। ওর সামনে ছিলো দুটো চাওয়ালা আর একটা পান-বিড়িওয়ালা। এপাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিকে জাসদ অফিসের সামনের রাস্তায় লোকজন বসেছে। অনেকে আইল্যাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়েছিলো। সানগ্লাসে ঢাকা জুয়েলের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ সার্চ লাইটের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সন্দেহজনক কাউকে।

মঞ্চে তখন কে যেন আবেগভরা গলায় বক্তৃতা করছিলো — 'পথ আমাদের একটাই, গন্তব্যও একটা। একাত্তরের চেতনায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গোটা জাতিকে এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে। একাত্তরের ঘাতকরা আজও ধর্মের নামে হত্যার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ ছাত্রদের তারা বেয়নেট দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে, হাত-পায়ের রগ কেটে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দিচ্ছে। ওরা হায়নার চেয়ে নৃশংস। মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যার পরও ওরা বলে, একাত্তরে আমরা ভুল করিনি। — '

ঠিক সোয়া পাঁচটার দিকে বায়তুল মোকার্‌রমের দক্ষিণ গেট-এর কাছে দুটো ককটেল ফাটলো। যিনি বক্তৃতা করছিলেন, থেমে গেলেন। ককটেলের শব্দ শুনে লোকজন উঠে দাঁড়ালো। কয়েকজন অকারণে ছুটোছুটি করে ত্রাস ছড়ালো। জাহানারা ইমাম লোকজনদের শান্ত করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জুয়েলের সকল ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে গেলো। সার্চলাইটের গতি দ্রুততর হলো। জাহানার ইমাম বললেন, 'আপনারা বসুন। আমাদের সভাকে ভাঙার জন্য জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা — '

দুম করে বোমা ফাটলো মঞ্চের কাছে। ঠিক তখনই জুয়েল দেখলো, জিপিও-র পাঁচিলের ভেতর থেকে একটি হাত জাহানারা ইমামের দিকে রিভলভার তাক করেছে। রাস্তার ওপার আর এপার, টার্গেট খুবই কাছে। জাহানারা ইমামের কথা শোনা যাচ্ছে না। কেউ মাইকের তার কেটে দিয়েছে। তবু তিনি দাঁড়িয়ে হাত তুলে কোলাহলমুখর জনতাকে শান্ত হতে বলছিলেন।

আততায়ীর মুখ মৌলবীদের সাদা চাদরে ঢাকা ছিলো। হাতের ভঙ্গি দেখে জুয়েল বুঝে ফেললো, আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলো সেদিকে। ওর চারপাশে ছেলেছোকরা ছিলো কতগুলো। গায়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো কয়েকজন। একই সময়ে জিপিও আর বায়তুল মোকার্‌রমের মাঝখানের রাস্তায় পুলিশ কয়েক রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে। জামাতীদের মিটিং থেকে কয়েক শ' লোক লাঠি হাতে এদিকে আসছিলো। টিয়ার গ্যাস তাদের বাধা দিলো।

ততক্ষণে রিভলভারধারী আততায়ী জুয়েলকে দেখতে পেয়েছে। মূর্তিমান মৃত্যুর মতো ওর দিকে ছুটে যাচ্ছিলো জুয়েল। আততায়ী প্রাণভয়ে বায়তুল মোকার্‌রমের

দক্ষিণ গেট–এর দিকে ছুটলো। গোটা এলাকায় তখন মহা হট্টগোল লেগে গেছে। নির্মূল কমিটির ছেলেরা জামাতীদের আসতে দেখে সেদিকে ছুটে গিয়েছিলো। পুলিশ বাধা দেয়াতে ওদের সঙ্গে পুলিশের লেগে গেলো। কর্মীদের এক দল জাহানারা ইমামকে কর্ডন করে জাসদ অফিসের ভেতরে নিয়ে গেলো।

আততায়ীর চেহারা চিনে ফেলেছে জুয়েল, কিন্তু পুরো স্পিডে দৌড়োতে পারছে না। ওর সঙ্গে চোদ্দ পনেরো জন ছেলেও বোলতার ঝাঁকের মতো দৌড়োচ্ছিলো। প্রথমে ও ভেবেছিলো, ওরাও বুঝি আততায়ীকে ধাওয়া করছে। কিন্তু না, একটু পরেই বুঝে ফেললো, ওর গতি রোধ করতে চাইছে ওরা। অনেকটা পথ দৌড়েও জুয়েল এই বোলতার ঝাঁক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না। যখন দেখলো, ওর সঙ্গে আততায়ীর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে তখনই ও পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়লো।

জুয়েলের পিস্তলের গুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিঠের ওপরে বাম দিক দিয়ে ঢুকে সরাসরি আততায়ীর হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে ওর গুলি। হুমড়ি খেয়ে লোকটা পড়ে গেলো। জুয়েল গতি কমালো, স্বস্তি বোধ করলো। লোকটার চেহারা ভালোভাবে একবার দেখার ইচ্ছা হলো। ঠিক তখনই পেছন থেকে ধারালো কিরিচের কোপ নেমে এলো ওর ঘাড়ের ওপর।

জুয়েল থমকে দাঁড়ালো। শেষ বিকেলের রোদে বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে অনেকগুলো কিরিচ ঝলসে উঠলো। জুয়েল এমনই বিস্মিত হয়েছিলো — বাধা দেয়ার আগেই ও চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট–এর সামনে বড় একটা এলাকা জুড়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের ছুটোছুটি আর কোলাহল। শব্দ করে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটছে। মানুষ প্রাণপণে ছুটছে। ফ্যাকাশে নীল আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, একটা কালো চিল শুধু ডানা মেলে ভাসছে।

একটা নয়, দুটো নয় — অনেকগুলো রাগী রাজহাঁস ওকে ক্রমাগত ঠোকরাতে লাগলো। বুকে, পিঠে, পেটে অবিরাম হিংস্র কামড়। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার শব্দ হচ্ছে বহু দূরে। সবাই এত আস্তে ছুটছে কেন? আকাশে উড়তে থাকা চিলটাও কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? বহু দূর থেকে তপু ডাকছে, 'জুয়েল ভাই, তুমি কোথায়?'

জুয়েল বলতে চাইলো, 'এই তো আমি! তোমাদের পথের বাধা সরিয়ে দিয়েছি।' ওর ঠোঁট নড়লো না। কোনো শব্দ হলো না।

ধীরে ধীরে সব কোলাহল থেমে গেলো। স্থির হয়ে গেলো ছুটে চলা মানুষের দল। জুয়েলের স্থির চোখের সামনে স্থির হয়ে গেলো ডানা মেলে ভাসা নিঃসঙ্গ কালো চিল।